Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুক্তা আক্তার

রোলঃ 228020050

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুক্তা আক্তার

রোলঃ 228020050

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুক্তা আক্তার, আইডিঃ 228020050 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Mukta Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মুক্তা আক্তার

আইডিঃ 228020050

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা: 5

প্রথম অধ্যায়: নামাজের পরিচয় এবং ফরজ হওয়ার ইতিহাস 6

দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরআন ও হাদীসের আলোকে সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত 8

তৃতীয় অধ্যায়: সালাত পরিত্যাগের পরিণতি — 12

চতুর্থ অধ্যায়: জামাআত সম্পর্কীয় হুকুম ও গুরুত্ব 15

পঞ্চম অধ্যায়: নফল নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা 18

কুসুফ ও খুসুফের হিকমত 26

ইস্তেখারা কখন করতে হয় 27

সালাত আদায়ের নিয়ম: 31

ষষ্ঠ অধ্যায় : নামাজ এবং বাস্তবতা 32

সপ্তম অধ্যায় :নারী ও শিশুদের নামাজ শিক্ষা 35

শিশুদের নামাজ: 35

অষ্টম অধ্যায়: নামাজ বনাম অন্যান্য ইবাদত — মর্যাদা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ 38

নবম অধ্যায় : মনের মত সালাত 39

উপসংহার 44

ভুমিকা:

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নামায। এটি ঈমানের স্বীকৃতি ও ইসলামী আত্মপরিচয়ের অন্যতম অনন্য প্রকাশভঙ্গি। সালাত এমন এক ইবাদত, যা আল্লাহ্ তাআলা সরাসরি উম্মতে মুহাম্মাদির ওপর ফরজ করেছেন, যা মিরাজের রাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়—এবং কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে মহান আল্লাহর নিকট হতে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়। এটি সালাতের মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত-

أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلى اللهِ ؟ قَالَ الصَّلوةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيِّ ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ .قُلْتُ ثُمَّ أَي ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلَ اللَّهِ) .متفق عليه(

অর্থাৎ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম-কোন্ আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন নামায। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন্ আমল বেশী প্রিয়? বললেন: মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

সালাত হলো মু'মিনের মিরাজ, হৃদয়ের প্রশান্তি এবং আত্মার পরিশুদ্ধি। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বলেন:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আল-আনকাবূত: ৪৫)

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

.العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر

"আমাদের ও তাদের মাঝে পার্থক্যের চিহ্ন হচ্ছে সালাত। যে তা পরিত্যাগ করে, সে কুফরি করেছে।" (তিরমিযী, হাদীস: ২৬২১)

এতে প্রতীয়মান হয় যে, সালাত পরিত্যাগ শুধু গোনাহ নয়, বরং ঈমানের মৌলিক ভিত্তিকেই সংকটে ফেলে দেয়। অথচ আজকের মুসলিম সমাজে সালাত অবহেলিত, বিস্মৃত ও অনেকাংশে উপেক্ষিত ইবাদতে পরিণত হয়েছে। তরুণ সমাজ, কর্মব্যস্ত মানুষ এবং নারীদের মাঝে সালাতের সচেতনতা আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। এটি এক মহা দুর্যোগ, যা আত্মিক অবক্ষয় এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলার সূচনা করে।

প্রথম অধ্যায়: নামাজের পরিচয় এবং ফরজ হওয়ার ইতিহাস

(১)সালাতের পরিভাষাগত ও পারিভাষিক সংজ্ঞা:

আরবি “সালাত” (الصلاة) শব্দটি لغوي অর্থে দো‘আ, রহমত, প্রশংসা ও বরকতের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শারঈ অর্থে সালাত হলো:

"أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم"

অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু কথা ও কাজ, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম দ্বারা শেষ হয়। (মারকাতুল মাফাতীহ, ২/৩৯০)

ইবনে হাজার (রহ.) বলেন:

"الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، بشرائط مخصوصة."

(ফাৎহুল বারি)

সালাত হচ্ছে আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্য ও খুশু-খুযুর সাথে আত্মসমর্পণের প্রতীক।

২.নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত কেনো

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। তবে বিভিন্ন সময়ে সেট করা। সব নামাজ সূর্যের অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত। কারণ, মানুষের চোখের সামনে সূর্যটা দৃশ্যমান। ভোরে সূর্য থাকে না। দুপুরে ঠিক মাথার উপর। বিকালে গাছের পেছনে। সন্ধ্যায় অস্ত। রাতে পুরোই হারিয়ে যায়।

সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সূর্যাস্ত, গভীর অন্ধকার। প্রশ্ন আসে, এসব সময়ে নামাজ কেন পড়া হয়?

ইবাদতগুলোর দুইটা পার্ট। হানাফিয়্যাহ আর ইসলাম। এ দুইটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সুন্নাহ।

হানাফিয়্যাহ হচ্ছে, দুনিয়ার দৃশ্যমান সবকিছুই অস্থায়ী, এসব থেকে মুখ ঘুরিয়ে আল্লাহমুখী হওয়া। যখনই বুঝতে পারবেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় নেই, তিনিই একমাত্র স্থায়ী। তখন সম্পূর্ণ তার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর কাছ বিলিয়ে দেয়া হচ্ছে ইসলাম।

নামাজই হচ্ছে হানাফিয়্যাহ ও ইসলামের বাস্তবিক ট্রেনিং।এবার প্রশ্নে আসা যাক। কেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আলাদা আলাদা উপযুক্ত সময় সেট করা হয়েছে?ফজর: সূর্যোদয়ের আগে ফজর নামাজ পড়তে হয়। ঐ সময়ে সূর্য থাকে না। আকাশে সূর্যের দেখা নাই। সূর্য নামক জিসিটাই যেন অধরা। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল নামাজের পাঁচ ওয়াক্ত কেন? ৩ ২৩৩

সব সময় আছেন, থাকবেন। ফজরের সময়ে, শক্তির আধার সূর্যের কোনো খবর নেই। মানুষের চিন্তাশীল মন ভাবে, এই সূর্য দিনে তার কত প্রখরতা। সে সূর্যটাকে এখন আর দেখতে পাই না। শিওর এটি অস্থায়ী। কারণ, দিনে আছে, ভোরে নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনো কোথাও

হারিয়ে যান না। তিনি আছেন অদৃশ্য আকারে। তিনি সব সময়ই অস্তিত্ববান। তিনিই সবচেয়ে মহান। নামাজে মানুষের উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে হয়, 'আল্লাহু আকবার।'

যোহর: মধ্যাহ্নে সূর্য একেবারে মাথার উপর থাকে। নামাজ পড়া তখন নিষিদ্ধ। যোহর ওয়াক্তের সময় সূর্য হেলে পড়ে। সূর্য এতক্ষণ মাথার উপর জ্বলজ্বল করছিল, নিজের প্রখরতা জানান দিচ্ছিল, তার পতন মাত্র শুরু হয়ে গেছে। আপনি ঐ সময় আল্লাহর সামনে নামাজে দাঁড়ান, নীরবে ঘোষণা দেন, 'ইয়া আল্লাহ, আপনি মহান, আপনার কোনো পতন নেই।'

আসর: গাছ অথবা পাহাড় সূর্যকে আড়াল করে দেয় এ সময়ে। সর্বদিক ছায়ার খেলা। সূর্য গাছের পেছনে পড়ে যায়। আসরের ওয়াক্তে নামাজে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে হয়, 'আল্লাহ আপনি এমন শক্তিশালী আর এমন ক্ষমতাধর, কেউ আপনাকে আড়াল করতে পারে না। আপনার রহমত থেকে আমাদের কেউ বঞ্চিত করতে পারে না।'

মাগরিব: কিছুটা আলো থাকে ওই সময়। কিন্তু সূর্যের অস্ত ঘটে। তার দীপ্তি এখন নিভু নিভু। প্রচণ্ড তাপশক্তির অবসান ঘটে। আকাশে তার সবচেয়ে দুর্বল অবস্থা। কিন্তু আল্লাহর শক্তির কোনো ধ্বংস নেই। দুর্বলতা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করে না, সুবহানআল্লাহ। তিনি সবসময়ই প্রখর আর প্রচণ্ড। মানুষকে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করতে হয় মাগরিব নামাজে।

এশা: মাগরিবে একটু আলো তবু দৃশ্যমান থাকে। কিন্তু এশায় পুরো পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে যায়। মনে হয় এ পৃথিবীর দিনের অবস্থা ছিল মিথ্যা। সূর্যের আলো ছিল মায়া। কোনো আশা নেই। গাঢ় অন্ধকারে মানুষের মন খুঁজে বেড়ায় জীবনের আশার আলো। আল্লাহ বলেন, 'বান্দা তুমি হতাশ হয়ো না, আমি আছি, আমার সামনে প্রশান্ত অন্তরে দাঁড়িয়ে যাও নামাজে, আমাকে স্মরণ করো উচ্চকণ্ঠে, আমার সামনে মাথা ঠেকাও আনন্দচিত্তে। অন্ধকারকে ভয় নেই। তোমার আল্লাহ জীবন থেকে অন্ধকারকে উঠিয়ে নিবেন। তিনিই মহান। তিনিই বড়, আল্লাহু আকবার।'

৩. সালাত ফরজ হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: মিরাজের রাত

সালাত ইসলামি শরীয়তে এমন এক ফরজ ইবাদত, যা দুনিয়ার কোনো জমিনে নয় বরং সপ্ত আসমানের ওপরে—সিদরাতুল মুনতাহায় আল্লাহ তাআলার দরবারে সরাসরি ফরজ করা হয়। এটি ফরজ হয় হিজরতের এক বছর পূর্বে, ইসরা ও মিরাজের রাতে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

".فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

(মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস: ১২২২ হজরত ইবনে হাযম ও আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ আমার উম্মতের ওপর ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিলেন। আমি সেটা নিয়ে ফিরে আসি। মুসা আলাইহিস সালামকে অতিক্রম করার সময় তিনি বললেন, আল্লাহ আপনার উম্মতের ওপর কী

ফরজ করেছেন? আমি বললাম, ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। তিনি বললেন, আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে ফিরে যান, আপনার উম্মত তো এতটা পালন করতে পারবে না। আমি তখন ফিরে গেলাম। আল্লাহ তাআলা কিছুটা কমিয়ে দিলেন। আমি মুসা আলাইহিস সালামকে পার হওয়ার সময় বললাম, কিছুটা অংশ (আল্লাহ) কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আপনি আবার আপনার রবের কাছে ফিরে যান। কারণ আপনার উম্মত এটুকুও আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম।

তখন আরও কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া হলো। আবারও মুসা আলাইহিস সালামএর কাছে গেলাম। এবারও তিনি বললেন, আপনি আবার আপনার প্রতিপালকের কাছে যান। কারণ আপনার উম্মত এও আদায় করতে

পারবে না। তখন আমি আবার গেলাম। তখন আল্লাহ বললেন, এই পাঁচটিই (পূণ্যের হিসাবে) ৫০ (বলে গণ্য হবে)। আমার কথার কোনো রদবদল হয় না। আমি আবার মুসা আলাইহিস সালামের কাছে গেলে তিনি আমাকে আবারও বললেন, আপনার প্রতিপালকের কাছে আরেক বার যান। আমি বললাম, আরেক বার আমার প্রতিপালকের কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। তখন জিবরিল আলাইহিস সালাম আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। সে সময় সেটি নানা রঙে রঞ্জিত ছিল। আমি এর তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত ছিলাম না।' (বুখারি ৩৪৯)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উর্ধ্ব জগতের সেই সফরে আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য উপহার স্বরূপ পেয়েছেন ৫ ওয়াক্ত নামাজ। যা প্রতিদিন আদায় করা মুমিন মুসলমানের জন্য আবশ্যক। মেরাজের প্রস্তুতি ও প্রাপ্তি নিয়ে এভাবে বিশদ বর্ণনা হাদিসের বর্ণনায় এভাবেই ওঠে এসেছে।

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, ফরজ হওয়া ৫ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করা। ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার মাধ্যমেই ৫০ ওয়াক্ত নামাজের সাওয়াব পাওয়ার আমল অব্যাহত রাখা। আল্লাহ তাআলা উম্মাতে মুহাম্মাদিকে হাদিসের ওপর যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। ফরজ হওয়া নামাজগুলো যথাসময়ে আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরআন ও হাদীসের আলোকে সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

আল-কুরআনুল কারীমে সালাতের প্রতি অসংখ্য স্থানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

"নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমার ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।"

(সূরা ত্বা-হা: ১৪)
এ আয়াতে সালাতকে আল্লাহর স্মরণ এবং ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু বানানো হয়েছে।
অন্যত্র বলেন:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾
"তোমার পরিবারকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং নিজেও ধৈর্যসহকারে তা পালন করো।"
(সূরা ত্বা-হা: ১৩২)

এছাড়াও নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝাতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد حاب وخسر.

কেয়ামতের দিন বান্দার কাছে

সর্বপ্রথম নামাজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। নামাজের হিসেব নেওয়া হবে। কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে না বান্দা দুনিয়াতে তোমার কয়টা বাড়ি ছিল।কয়টা গাড়ি ছিল? কতখানি জমি ছিল। কোন এলাকার নেতা ছিলা? কোন আসনের এমই ছিলা? এসব বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না।আল্লাহ তায়ালা আপনার আমার কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা রাখবেন তা হচ্ছে বান্দা নিয়মিত নামাজ পড়েছ কিনা? সঠিকভাবে নামাজ পড়েছ কিনা? হিসেব দাও। যদি সঠিকভাবে নামাজের হিসাব দিতে পারে তাহলে সে সফলকাম হয়ে যাবে। আর যদি হিসেবে গরমিল হয় তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিরমিজি, সহীহ হাদিস

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ونجاة وبرهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي ابن خلف .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিঃ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামাজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে (নামাজ) তার জন্য নূর, দলীল ও নাজাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে না তার কোনো নূর, দলীল ও নাজাতের ব্যবস্থা হবে না। সে কেয়ামতের দিন কাড়ুন, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে। —মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৫৭৮
উলামায়ে কেরাম বলেন,
ধন সম্পদের কারণে যারা নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলো তাদের হাশর হবে কারুনের সাথে।
নেতৃত্ব ও রাজনীতির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে ফেরাউনের সাথে।
চাকরি বাকরির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে হামানের সাথে।

ব্যবসা বাণিজ্যর কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে উবাই ইবনে খালফের সাথে।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত ফরমান আসমান থেকে হযরত জিবরাইল আ.কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর নামাজ এমন এক মহান ইবাদাত, যা আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আ কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠান নাই বরং আল্লাহর রাসূল সাহিবে মিরাজ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া থেকে সাত আসমানের উপর তুলে নিয়ে সেখানে নামাজ ফরজ করেছেন। রোজা ফরজ হয়েছে জমিনে আর নামাজ ফরজ হয়েছে আসমানে। যাকাত ফরজ হয়েছে জমিনে আর নামাজ ফরজ হয়েছে আসমানে। অন্যান্য বিধান নাযিল হয়েছে ফেরেশতার মাধ্যমে আর নামাজের বিধান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إني فرضت علي أمتك خمسَ صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ...ابن ماجة

নামাজ ফরজ করার পর আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন। ‘ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিলাম। আর আমি ওয়াদা দিলাম, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবে আমি আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি নামাজের হিফাজত করবে না তার জন্যে আমার কোনো ওয়াদা নেই। (ইবনে মাজাহ ৪৩০)

কিয়ামতের দিন লক্ষকোটি বনী আদম যখন বিচারের মাঠে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তায়ালা তখন জিজ্ঞেস করবেন, দুনিয়ার বুকে কারা আমাকে সিজদা করেছ? হাত উঠাও, সেদিন সবাই হাত উঠিয়ে বলবে আমরা সিজদা করেছি, নামাজি-বেনামাজি, কাফের-মুশরিক সবাই হাত উঠাবে। কেউ বাদ থাকবেনা। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন ঠিক আছে তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক, এই মুহূর্তে সবাই আমাকে সিজদা করো। তখন সবাই আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় চলে যাবে। সবাই যখন সিজদায় চলে যাবে একদল মানুষ তখন দাঁড়িয়ে থাকবে। সিজদা করতে পারবে না। শত চেষ্টা করেও সিজদা করতে পারবে না। তাদের মেরুদন্ডের হাড্ডিটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাবে। তারা কারা জানেন? বেনামাজীর দল। কেয়ামতের দিন ঐ বেনামজীর দল ধরা খেয়ে যাব। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। চেহারা লাল হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের বলেন, ৬৮: আল-ক্বলম,:আয়াত: ৪২,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَۙ

(স্মরণ করো) যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাটন হয়ে যাবে, তখন তাদের সিজদাবনত হওয়ার আহবান জানানো হবে, এসব হতভাগা ব্যক্তি (কিন্তু সেদিন সিজদা করতে) সক্ষম হবে না। সূরা কলাম আয়াত ৪২

وقد كانوا يدعون الي السجود وهم سالمون ঐসব লোককে নামাজের জন্য (দৈনিক পাঁচবার আমার ঘর মসজিদে থেকে ডাকা হত) কিন্তু তারা সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও নামাজে আসত না। (সূরা কলাম ৪৩)

ঐ বেনামাজি -দেরকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নামের ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে? ওরে হতভাগার দল তোরা জাহান্নামে কেন আসলি, জাহান্নামে তো কোন ভালো মানুষ আসেনা।

ما سلككم في سقر

তোদের অপরাধ কি? তারা বলবে

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَۙ

আমাদের অপরাধ হচ্ছে আমরা দুনিয়াতে মুসল্লী ছিলাম না। আমরা হলাম বেনামাজির দল। এই নামাজ না পড়ার কারণে আজ আমাদের এই দুরবস্থা। (সূরা মুদ্দাসিসর আয়াত ৩৩-৪৪)

দেহ যদি ময়লা ও নাপাক হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি দিয়ে পরিষ্কার করি? সাবান দিয়ে? এবার বলেন আপনার অন্তরটা যদি গোনাহের ময়লা দিয়ে নাপাক ও ময়লা হয়ে যায় তাহলে কোন সাবান দিয়ে পরিষ্কার করবেন? লাইফবয়? লাক্স? কেয়া? না ভাই দুনিয়ার তামাম সাবান যদি গায়ে মেখে শেষ করে ফেলেন তবুও সরিষা দানা পরিমাণ গোনাহও অন্তর থেকে দূর হবে না। এই গোনাহ পরিষ্কার করতে হলে নামাজ নামক সাবান ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ارءيتم لو أن نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرّآت هل يبقى من درنه شيء قال لا يبقى من درنه قال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا

তোমাদের কারো বাড়ির দরজার সামনেই যদি একটি নদী থাকে আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সবাই বল্ল না, তার শরীরে কোন প্রলার ময়লা থকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের দৃষ্টান্ত | এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সকল পাপ মুছে নিঃশেষ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)
শুধু তাই নয়, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের জন্যে অযু করে তাহলে সে অযুর বিনিময়েই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গোনাহ ক্ষমা করতে থাকেন।

إذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خَطِيئَةٍ نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء أو نحو هَذَا وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ "

যখন কোন মুমিন অথবা মুসলিম বান্দা অযূ করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে, তার মুখমণ্ডল হতে তার চোখের দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়।

যখন সে তার দুহাত ধৌত করে,তখন তার দুহাত দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে তা ওযুর পানির সাথে অথবা শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়। অতঃপর সে সকল গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম ও তিরমিজি)।

وعن أبي ذر أن النبي ﷺ خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل رَوَاهُ أَحْمَد...

আবু যর রাযি: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক শীতের মৌসুমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি একটি গাছের দুটি ডাল ধরে নাড়া দিলেন, ফলে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। হযরত আবু যর রাযি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে সলাতে আদায় করে, তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। (আহমদ, সহীহ)।

তৃতীয় অধ্যায়: সালাত পরিত্যাগের পরিণতি –

সালাত পরিত্যাগের পরিণাম : ইচ্ছেকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে রাসূল (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। বে-নামাযীর জন্য ১৪ প্রকার শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে : হাদীস শরীফে এসেছে : যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করে। আল্লাহ তায়া’লা তাকে চৌদ্দ প্রকার শাস্তি প্রদান করেন। দুনিয়ায় পাঁচ প্রকার শাস্তি : ১. তার জীবন ও জীবিকার বরকত কেড়ে নেয়া হবে। ২. তার চেহারা হতে নেক্কার লোকদের নূর মুছে ফেলা হবে। ৩. সে যেকোন নেক আমল করুক আল্লাহ তায়া’লা তাতে কোন ছওয়াব দান করেন না। ৪. তার কোন দো’য়াই কবুল হয়না। ৫. নেককারদের দো’য়ায় তার কোন অংশ থাকে না। অর্থাৎ উক্ত দো’য়ার বরকত হতে বঞ্চিত থাকে।

মৃত্যু কালিন তিন প্রকার শাস্তি : ১. অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় তার মৃত্যু হবে। ২. ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যু বরন করবে। ৩. চরম তৃষ্ণার্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। যদি সমস্ত পৃথিবীর সাগরের পানিও তাকে পান করান হয়, তবুও তার তৃষ্ণা নিবৃত্ত হবেনা।

কবরের তিন প্রকার শাস্তি : ১. তার কবর এত সংকীর্ণ করা হবে যে, তার এক পাঁজরের হাড় অন্য পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। ২. তার কবরে আগুন জ্বালানো হয়, সে উহার শিখার উপর দিনরাত উলট-পালট অবস্থায় দগ্ধ হতে থাকে। ৩. তার কবরে একটি ভয়ংকর বিষধর অজগর নিয়োগ করা হবে। যার চোখ দু’টি আগুনের এবং নখরগুলি লোহার তৈরী হবে। অজগরটি

বজ্রের ন্যায় আওয়াজ দিবে এবং মৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টা রাতদিন কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে।

কিয়ামতের তিন প্রকার শাস্তি : ১. অত্যন্ত কড়াকড়ি ভাবে বে নামাযীর হিসাব নেয়া হবে। ২. তার উপর আল্লাহর কহরের শাস্তি হবে। ৩. অত্যন্ত অপমানের সাথে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে : কিয়ামতের দিন বে-নামাযীর কপালে তিনটি লাইন লিখা অবস্থায় উঠবে। 'হে আল্লাহর হক বিনষ্ট কারী। হে আল্লাহর গজবের পাত্র। দুনিয়াতে তুমি যেভাবে আল্লাহর হক নষ্ট করেছ, সে রূপ আজ তুমি আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত'। (জাওয়াজেরে ইবনে হাজর মককী, ফাজায়েলে নামায)।

সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে শরয়ী দিকনির্দেশনায় ওলামায়ে কেরামগণ কি অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন। যেমন : আহলে যাওয়াহেরর মতে, ইচ্ছেকৃতভাবে নামায পরিত্যাগকারী কাফের হবে। কেননা হাদিসে মোবারকায় এসেছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, সালাত পরিত্যাগকারীর কাফের হয় না, তবে কুফরীর নিকটবর্তী চলে যায়। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহ.) মতে, সালাত পরিত্যাগকারী কাফের না হলেও তাকে হত্যা করা ফরয। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) মতে, সালাত আদায় না করা পর্যন্ত তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া ও জেলে আবদ্ধ রাখা ওয়াজিব।

অতএব, জ্ঞান থাকতে কোন মুমিনের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই সালাত পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। সালাত কায়েমে সরকারের ভূমিকা : সূরা হজ্জের ৪১ নং আয়াতে সালাত কায়েমে মুসলিম দেশের সরকার ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, পৃথিবীতে তাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দেয়া হলে তারা সালাত কায়েম করে। দেশের জনগণকে সৎ ও ন্যায়-নিষ্ঠাবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি মুসলিম দেশের সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সমাজে যথাযথভাবে নামায প্রতিষ্ঠা করা।

যাতে মানবজাতি সালাত আদায়ের মাধ্যমে যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে দূরে অবস্থানপূর্বক এর বিনিময় নিজেদেরকে সৎ ও নিষ্ঠাবান লোক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে এবং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে বিশ্বকে সুখী সমৃদ্ধিশালী আবাসভূমি হিসেবে রুপান্তর করতে পারে।

সোর্স: ডেইলি ইনকিলাব

কুরআন ও হাদিসের আলোকে সালাত পরিত্যাগের পরিণাম:

১. নামাজ পরিত্যাগ: শাস্ত্রীয় অবস্থান

ইসলামি শরীয়তে সালাত পরিত্যাগ করা অত্যন্ত ভয়াবহ অপরাধ হিসেবে গণ্য। উলামায়ে কেরামের মতে, সালাত ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন:

"من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر كفرًا مخرجًا من الملة."

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করে, সে ইসলামের বাইরে চলে যায়।"

(মসনদ আহমাদ, হাদীস: ৮৭৮২)

২. কুরআনের আলোকে ভয়াবহ পরিণতি

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

"অতএব ধ্বংস তাদের জন্য, যারা সালাত আদায় করে অথচ তারা তাদের সালাতের প্রতি গাফিল।"

(সূরা আল-মাউন: ৪-৫)

এই আয়াতে 'ওয়াইল' শব্দটি এসেছে, যা একটি জাহান্নামের নাম—এতে বোঝা যায়, সালাতের গাফেলদের পরিণতি কত ভয়াবহ।

৩. হাদীসের আলোকে ভয়াবহতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"من ترك الصلاة فقد كفر."

"যে সালাত ছেড়ে দেয়, সে কুফরি করেছে।"

(তিরমিযী: ২৬২১)

"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة."

"মানুষ ও কুফরির মাঝে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ।"

(মুসলিম: ৮২)

৪. পরকালে শাস্তির চিত্র

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾

"তোমরা কী কারণে সাকার (জাহান্নাম)-এ গিয়েছিলে?

তারা বলবে: 'আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।'"

(সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৪২-৪৩)

৫. দুনিয়াবি পরিণতি

হৃদয়ে অস্থিরতা ও চিন্তার অসন্তোষ।

চরিত্রের অবনতি ও পাপপ্রবণতা বৃদ্ধি।

দুঃখ, ব্যর্থতা ও অশান্তি সর্বত্র।

সমাজে অবিনয়, অন্যায় ও দুর্নীতির বিস্তার।

সালাত পরিত্যাগ কেবল একটি গোনাহ নয়, বরং এটি ইমানের সীমারেখা পার হওয়ার উপক্রম। কুরআন ও হাদীসের ভাষা অত্যন্ত কঠোর—যা প্রমাণ করে, সালাত ছাড়া মুসলমানের কোনো অবস্থান নেই। তাই সালাত কায়েম করা শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়; বরং এটি দ্বীনি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা।

চতুর্থ অধ্যায়: জামাআত সম্পর্কীয় হুকুম ও গুরুত্ব

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয় ইসরা' ও মি'রাজের রাত্রে। ঠিক তার পরের দিন যোহরের সময় জিবরীল (আঃ) প্রিয় নবী ()-কে নিয়ে জামাআত সহকারে প্রথম নামায পড়েন। অনুরুপভাবে মুসলিমরাও মহানবী (৪)-এর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে তাঁর অনুসরণ করেন। আর জিবরীলের ইমামতির পর মহানবী (৫) মক্কা মুকারামায় কোন কোন সাহাবীকে নিয়ে কখনো কখনো জামাআত সহকারে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু মদীনায় হিজরত করার পর জামাআত একটি বাঞ্ছিত নিয়ম ও ইসলামী প্রতীকরূপে গুরুত্ব পেয়েছে। আর সকল নামাযীকে জামাআতবদ্ধ ও জমায়েত করার জন্য বিধিবদ্ধ হল আযান।

আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিমে জামাতে নামাজ পড়ার ব্যাপারে এভাবে তাগিদ দিয়েছেন-

و ارْكَعُوْا مَعَ الرَّكِعِيْنَ

'আর রুকুকারীদের সঙ্গে (জামাতে) একসঙ্গে রুকু করো।' (সুরা বাকারা: আয়াত ৪৩)

হাদিসে এসেছে যে, "যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের (আযান) শোনে এবং কোন ওজর (ভয় অথবা অসুখ) তাকে জামাআতে উপস্থিত হতে বাধা না দেয়, তাহলে যে নামায সে পড়ে সে নামায কবুল হয় না।" (আবূদাঊদ, সুনান-৫৫১)

"যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামাআতে) নামায কায়েম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগ পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।" (আহমাদ, মুসনাদ, আবুদাউদ, সুনান ৫১১, নাসাঈ, সুনান, ইবনে হিব্বান, সহীহ, হাকেম, মুস্তাদরাক ১/২৪৫, সহিহ তারগিব ৪২২নং)
যারা নামাযের জামাআতে মসজিদে হাজির হয় না, মহানবী (৫) তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (৪) বলেন, "মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী নামায হল এশা ও ফজরের নামায। ঐ দুই নামাযের কি মাহাত্ম আছে, তা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কাউকে নামাযের ইকামত দিতে আদেশ দিই, অতঃপর একজনকে নামায পড়তেও হুকুম করি, অতঃপর এমন একদল লোক সঙ্গে করে নিই; যাদের সাথে থাকবে কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই, যারা নামাযে হাজির হয় না। অতঃপর তাদেরকে

ঘরে রেখেই তাদের ঘরবাড়িকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিই।" (বুখারী ৬৫৭, মুসলিম, সহীহ ৬৫১নং)

হযরত উসামা বিন যায়দ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (৪) বলেন, "লোকেরা জামাআত ত্যাগ করা হতে অবশ্যই অবশ্যই বিরত হোক, নচেৎ আমি অবশ্যই তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।" (ইবনে মাজাহ্, সুনান, সহিহ তারগিব ৪৩০নং)

জামাআত ত্যাগ করা মুমিনের গুণ নয়; বরং তা মুনাফিকের গুণ। মহান আল্লাহ এদের গুণ বর্ণনা করে বলেন,

(وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ)

অর্থাৎ, ওরা (মুনাফেকরা) নামাযে শৈথিল্যর সাথে হাজির হয় এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবেই দান করে থাকে। (কুরআন মাজীদ ৯/৫৪)

বিশেষ করে এশা ও ফজরের নামায মুনাফেকের জন্য অধিক ভারী। আর একথা পূর্বে এক হাদীসে আলোচিত হয়েছে।

ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'আমরা যখন কোন লোককে ফজরের নামাযে অনুপস্থিত দেখতাম, তখন তার প্রতি কু ধারণা করতাম।' (ত্বাবরানি, ইবনে আবী শাইবা, বাযয়ীফ, মাজমাউয যাওয়াইদ, হাইযামী ২/৪০)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কাল আল্লাহর সাথে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করতে আনন্দবোধ করে, তার উচিৎ যেখানে আহবান করা হয় সেখানে (অর্থাৎ মসজিদে) ঐ নামাযগুলির হিফাযত করা। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য বহু হেদায়াতের পথ ও আদর্শ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং ঐ (নামায) গুলি হেদায়াতের পথ ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের স্বগৃহে নামায পড়ে নাও; যেমন এই পশ্চাদগামী তার স্বগৃহে নামায পড়ে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেলবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেল, তাহলে তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন (ওযু) করে এই মসজিদসমূহের কোন মসজিদের প্রতি (যেতে) প্রবৃত্ত হয়, আল্লাহ তার প্রত্যেক পদক্ষেপের পরিবর্তে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করেন এর দ্বারায় তাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করেন ও এর দ্বারায় তার একটি পাপ হরাস করেন। ('মুসলিম সহিহ : ৬৫৪ নং)

হযরত ওসমান বিন আফফান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (৫) বলেন, "যে ব্যক্তির মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হয়, অতঃপর বিনা কোন প্রয়োজনে বের হয়ে যায় এবং ফিরে আসার ইচ্ছা না রাখে, সে ব্যক্তি মুনাফিক।" (ইবনে মাজাহ্, সুনান, সহিহ তারগিব-১৫৭নং)

যারা আহবানকারী মুআযযিনের আযানে সাড়া দিয়ে জামাআতে উপস্থিত হয় না, কিয়ামতে তাদের বিশেষ অবস্থা ও শাস্তি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

(يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

অর্থাৎ, যেদিন পদনালী উন্মুক্ত করা হবে এবং ওদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে, কিন্তু ওরা তা করতে সক্ষম হবে না। হীনতাগ্রস্ত হয়ে ওরা ওদের দৃষ্টি অবনত করবে। অথচ যখন ওরা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তো ওদেরকে সিজদা করতে আহবান করা হয়েছিল। (কুরআন মাজীদ ৬৮/৪২-৪৩) (বুখারী ৪৯১৯ নং)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "একাকীর নামায অপেক্ষা জামাআতের নামায সাতাশ গুণ উত্তম।" (বুখারী ৬৪৫নং, মুসলিম ৬৫০নং)

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি নামাযের জন্য পরিপূর্ণরূপে ওযু করে কোন ফরয নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যায় এবং তা লোকেদের সাথে অর্থাৎ জামাআত সহকারে অথবা মসজিদে পড়ে, আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।" (মুসলিম, সহীহ ২৩২নং)

জামাতে নামাজ পড়ার হুকুম:

১. পুরুষের জন্য ৫ ওয়াক্ত নামাজই জামাতে আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা; যা ওয়াজিবের সঙ্গে তুলনীয়। (অর্থাৎ এটি ওয়াজিবের কাছাকাছি)।'

২. কোনো ওজর বা অপারগতা ছাড়া জামাত থেকে বিরত থাকা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি জামাত ত্যাগে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে গুনাহগার হবে।'

নামাযের এক রাকআত ইমামের সাথে পেলে জামাআতের পূর্ণ ফযীলত পাওয়া যায়। মহানবী (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকআত নামায পেয়ে গেল, সে নামায পেয়ে গেল।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪১২নং)

তবে জামাতে নামাজ পড়ার জন্য ৪ শর্ত প্রযোজ্য।

জামাতে নামাজ পড়ার ৪ শর্ত:

১. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। যার ওপর নামাজ ফরজ হয়েছে সে ব্যক্তির জন্য জামাতে নামাজ আদায় করা আবশ্যক। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর জামাত আবশ্যক নয়।

২. জামাত নামাজ পড়ার জন্য পুরুষ হওয়া আবশ্যক। নারীর জন্য তা আবশ্যক নয়।

৩. সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, জ্ঞানবান হওয়া আবশ্যক। অজ্ঞান, পাগল বা নেশাগ্রস্তদের জন্য জামাত আবশ্যক নয়।

৪. যে সব ওজর-আপত্তির জন্য জামাত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি রয়েছে, সে সব ওজর-আপত্তি না থাকা।' (বুখারি)

ওজরগুলো হলো-

১. প্রচণ্ড বৃষ্টি থাকলে;

২. অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হলে;

৩. বেশি অন্ধকার হলে;

৪. মসজিদে যাওয়ার পথ ভীষণ কাদা বা ঝুঁকিপূর্ণ হলে;

৫. প্রচণ্ড ঝড় হলে;

৬. হেঁটে মসজিদে যেতে না পারার মতো অসুস্থ হলে;

৭. চলাচলে অক্ষম প্রবীণ হলে

৮. দৃষ্টিহীনের সাহায্যকারী না থাকলে;

৯. কেউ যদি এমন রোগীর সেবায় ব্যস্ত থাকে যে, তার অনুপস্থিতিতে রোগীর ক্ষতি বা কষ্ট হবে; তাহলে তার জামাআতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক নয়।

১০. সফরে কাফেলার যাত্রার সময় হয়ে গেলে; গাড়ী ও জাহাজ ছেড়ে দেয়ার সময় হয়ে গেলে এবং মাল-সামানা হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলেও জামাতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক নয়।

১১. জামাতের সময় ইস্তিঞ্জার হাজত হলে;

১২. ক্ষুধার সময় খাবার সামনে উপস্থিত হলে এবং খাবার চাহিদা থাকলে জামাতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক নয়।

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী জামাতে নামাজ আদায় করা। জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে ২৫/২৭ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়ার তাওফিক দান করুন।

পঞ্চম অধ্যায়: নফল নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা

ফরয নামাযের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। এই হিসাবে পার হতে না পারলে নাজাত পাওয়া যাবে না। তবে ফরয নামাযে যদি কোন ত্রুটি থাকে আর তার নফল নামায পড়া থাকে, তাহলে তার নফল দ্বারা তার ফরযের ত্রুটি পূর্ণ করে দিয়ে তার নাজাতের ব্যবস্থা করা হবে। নফল দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হয়। আমাদের কার নামায এমন হয়, যার মধ্যে কোনই ত্রুটি থাকে না? তাই ফরয নামাযের সাথে নফল নামাযও পড়া চাই। যাতে আমাদের আদায়কৃত নফল দ্বারা আমাদের ফরযের ত্রুটি পূর্ণ হতে পারে এবং আমরা নাজাত পেতে পারি। তদুপরি নফল নামায দ্বারা আল্লাহ্র সাথে বান্দার নৈকট্য লাভ হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيمَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلوتُهُ .فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ افْلَحَ وَانْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَيْرَ .وَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ قَالَ الرَّبُّ انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ
(عمله على ذلك - رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ফরয নামাযের হিসাব হবে। তার নামায ঠিক হলে সে কামিয়াব হবে এবং তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। আর যদি তার নামায ঠিক না হয়, তাহলে সে ব্যর্থ হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয নামাযে কিছুটা ত্রুটি বের হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এই বান্দার কিছু নফল আছে কি না দেখ। যদ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর বান্দার অন্যান্য আমলেরও এই নীতিতে হিসাব হবে।

তাই নফল নামায বেশী বেশী পড়া চাই। বুযুর্গানে দ্বীন কী পরিমাণ নফল পড়তেন তা চিন্তা করতেও অবাক লাগে। হযরত মুয়াযাহ্ আদাবিয়া (রহ.) এক আশ্চর্য রকমের বুযুর্গ মহিলা ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে তিনি হাদীছ শ্রবণ করেছেন। যখন সকাল হত তখন হযরত মুয়াযাহ্ আদাবিয়া (রহ.) ভাবতেন আজই আমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। এই চিন্তা করে সারা দিন তিনি ঘুমাতেন না। নফল নামায পড়তে থাকতেন। তিনি ভাবতেন যদি ঘুম যাই আর এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তো আমি আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলাম। যখন রাত্রি আসত, তখন তিনি ভাবতেন হয়ত এই রাতেই আমার মৃত্যু এসে যেতে পারে। অতএব যদি ঘুমের অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়, তাহলে তো মৃত্যুর সময় আল্লাহর নামও নিতে পারব না। তাই সারা রাত তিনি জেগে থাকতেন এবং নফল নামায পড়তে থাকতেন। আর নিজের নক্সকে বলতেন, "একটু অপেক্ষা কর। ঘুমের সময় তো সামনে আসছে।" অর্থাৎ, মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত ঘুমাতে পারবে। এভাবে তিনি রাত-দিন জাগ্রত থেকে রাত্রদিনে ৬ শত রাকআত নফল নামায পড়তেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আর কোন দিন বিছানায় যাননি। '১

এছাড়াও হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সা. ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ :مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أحبه، فإذا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي ،لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ .يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

"আল্লাহ তা'আলা বলেন: যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করলো আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। ফরয আমল চাইতেও আমার নিকট অধিক প্রিয় এমন কোন আমল নেই যার মাধ্যমে কোন বান্দাহ আমার নিকটবর্তী হতে পারে। এতদসত্ত্বেও কোন বান্দা যদি লাগাতার নফল আমলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয় তখন আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি কখনো কাউকে ভালোবাসলে তার কান আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই শুনে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার চোখও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই দেখে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার হাতও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়।

তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই ধরে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার পাও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুর প্রতিই চলে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। সে আমার নিকট কোন কিছু চাইলে আমি তাকে তা দিয়ে থাকি। আমার নিকট সে কোন কিছু থেকে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে তা থেকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আমি কোন কিছু করতে এতটুকুও ইতস্তত করি না যতটুকু ইতস্তত করি কোন মু'মিনের জীবন নিতে। সে মৃত্যু চায় না। আর আমি তাকে কোন ভাবেই দুঃখ দিতে চাই না''

নফল সালাত:ফরজের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাজ করে।

নবী সা. বলেন,

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل :انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فَيُكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك

"কিয়ামতের দিন প্রথম যে আমলের হিসাব নেয়া হবে তা হলো সালাত। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের লক্ষ্য

করে বলবেন-যদিও তিনি এ বিষয়ে সমধিক জ্ঞানী-তোমরা আমার বান্দার সালাত দেখ, সে কি পূর্ণাঙ্গরূপে

আদায় করেছে, না অপূর্ণাঙ্গরূপে? যদি তা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হয়ে থাকে তবে তা পূর্ণাঙ্গরূপেই লিখা হবে।

আর যদি অপূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তাআলা বলবেন: দেখ, আমার বান্দার কোনো নফল সালাত আছে কি না? নফল সালাত থেকে থাকলে আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'আমার বান্দার ফরয সালাত নফল সালাত দিয়ে পূর্ণাঙ্গ করে দাও। এরপর অন্যান্য আমলের হিসাব নেয়া হবে।

** বুখারী ৬৫০৭*

তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত

এ সালাত হলো দু রাকাআত যা মসজিদে প্রবেশকারীর প্রবেশের পর; আদায় করা শরীয়তসিদ্ধ। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসার পূর্বেই দু রাকাআত সালাত পড়ে নেয়।'

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

যে সব সময়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ; ঐসব সময় ব্যতিত তা আদায় করা সুন্নত। সুতরাং আসর বা ফজরের পর বা ফজরের পূর্বে তা আদায় করবেনা। বরং তাসবীহ-তাহলিল বা দরুদ পাঠ করবে।

মসজিদের প্রবেশের পর যদি দেখা যায়; ফরয সালাত দাঁড়িয়ে গেছে এমতাবস্থায়ও তা আদায় করা যাবেনা।

কেউ যদি বারবার মসজিদে প্রবেশ করেন; তাহলে পুরো দিনের প্রথমবার আদায় করাই যথেষ্ঠ হবে।

*** তাহিয়্যাতুল অজুর সালাত**

এ সালাত হলো দু রাকাআত, যা অযুর পরপরই আদায় করতে হয়

উকবাহ ইবনে 'আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ له الجنة

তিনি বলেন, আমার ওপর উট চড়ানোর দায়িত্ব ছিল। আমার পালা এলে আমি উট চরিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর রাসূল (সা.) কে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। তখন আমি তাঁর এ কথা শুনতে পেলাম, "যে মুসলিম সুন্দরভাবে ওযু করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে আল্লাহ্র প্রতি নিবন্ধ রেখে দু রাক'আত সালাত আদায় করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

আবু হুরায়রা রা: বর্ণনা করেন, নবী সা.; বিলাল রাযি, কে বলেছেন,

يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة .قال ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً، في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى :

"হে বিলাল, তুমি আমাকে এমন একটি আমলের কথা বল যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর করেছ এবং যে ব্যাপারে তুমি সবথেকে বেশি আশাবাদী; কেননা আমি জান্নাতের সম্মুখে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল রাখি, বললেন, 'আমি তেমন কোনো আশার আমল করিনি তবে আমি রাতে বা দিনে যখনই অজু করেছি তখনই আমি ওই অজু দ্বারা যতটুকু সম্ভব সালাত পড়েছি।'

বি.দ্র- কেউ যদি অযুর পরপরই ফরয সালাত আদায় করে; তাহলে এর ফযীলত আদায় হয়ে যাবে। *[প্রাগুক্ত 108]*

১ তিরমিহী-৬৩, আবুদাউদ ২৮-৬৫

** ফিকহুল ইবাদাহ লিল- হালাবী পৃ-108*

**মুসলিম 44।*

*** সালাতুল ইশরাক**

ফজরের সালাত পড়ার পর সেই স্থানেই বসে, জিকির আজকার, দুআ দরূদ, ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি করতে থাকা। দুনিয়াবী কোন কথা না বলা। এভাবে যখন সূর্য উদিত হয়ে যায়। এর দশ বারো মিনিট পর যে দুই/চার রাকাআত সালাত পড়া হয় সেই সালাতকে ইশরাকের সালাত বলা হয়। তবে ফজর সালাত পড়ে দুনিয়াবী কাজে মগ্ন হয়ে

গেলে সূর্য উদিত হবার পর যদি ইশরাক পড়া হয় তবুও শুদ্ধ হবে। তবে সওয়াব কিছুটা কম হবে। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাকাআত সালাত আদায় করে- তার জন্য একটি হাজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হাজ্জ ও
উমরার সাওয়াব)।**

খ. হযরত হাসান বিন আলী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত পড়ে, তারপর আল্লাহর জিকির করতে থাকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। তারপর দুই রাকাআত বা চার রাকাআত সালাত আদায় করে, তাহলে জাহান্নামের আগুণ তার চামড়া স্পর্শ করবে না।

বুখারী 17/1008
**তিরমিজী, রাচ৮৬*
** শুয়াবুল ঈমান দিনবায়হাকী ৩৬৭১*

সূর্য এক বর্ষা পরিমাণ উর্ধ্বে উঠার পর যে সালাত আদায় করা হয়, তাকেই চাশতের সালাত বলে। আরবিতে বলে সালাতুদ্দুহা। এ সালাতের সময় শুরু হয় সূর্যোদয়ের পর এক বর্ষা পরিমাণ ঊর্ধ্বে উঠে গেলে। পশ্চিমাকাশে সূর্য চলে যাওয়ার সামান্য সময় পূর্ব পর্যন্ত এ সালাতের সময় থাকে।

আবু যর (রাঃ) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন,

চাশতের সালাতের ফযীলত

يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة .فكل تسبيحة صدقة .وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة ،صدقة .وكل تكبيرة صدقة .وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة .ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

তিনি বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, তাকে তার প্রত্যেক জোড়াগুলোর পরিবর্তে সাদকাহ দেয়া লাগে। কাজেই প্রত্যেক বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা সাদকাহ হিসেবে বিবেচিত হয়, প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবর' বলা সাদকা হিসেবে গণ্য হয় এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করাও সাদকাহ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর এসবের মুকাবিলায় চাশতের দু'রাকআ'ত সালাতই হবে যথেষ্ট।। 10

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كل شهر، وصلاة الضحى، وَنُوْمٍ عَلى وتر.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খলীল ও বন্ধু [নবী (সা.)] আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়্যাত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করব না। (তা হলঃ) ১. প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করা ২. সালাতুয-যোহা (চাশত এর সালাত আদায় করা) ৩. বিত্র (সালাত) আদায় করে শয়ন করা।।।

চাশতের সালাতের রাকাআত সংখ্যা

গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী চার রাকাআত তবে ফকীহদের কারও কারও নিকট চাশতের সালাত দু রাকাআত, ছয় রাকাআত এবং আট রাকাআত আদায় করা যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ প্রমাণিত। তবে আট রাকাআত আদায় করা উত্তম।

উম্মু হানী (রাঃ) বলেছেন,

إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخلَ بَيْنَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودَ.

মুসলিম ৭২০

" সহিহ বুখারী, তাহাজ্জুদ অধ্যায়, ১১৭৮

"নবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন (পূর্বাহ্নে) তাঁর ঘরে গিয়ে গোসল করেছেন; এবং আট রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। (তিনি বলেছেন) যে, আমি আর কখনো (তাঁর) অনুরূপ সংক্ষিপ্ত সালাত দেখিনি। তবে কিরাআত ছাড়া তিনি রুকু ও সিজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করেছিলেন।।২

*** আওয়াবীন**

মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত পড়ার পর থেকে এশার সময় হবার আগ পর্যন্ত যে নফল সালাত পড়া হয়, সেটাকে আওয়াবীন সালাত বলা হয়। তবে কিছু হাদীসে চাশতের সালাতকেও আওয়াবীন সালাত বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য উলামাদের মতে চাশতের সালাত আলাদা আর আওয়াবীন সালাত স্বতন্ত্র। চাশতের সালাতের সময় হল, সূর্য উদিত হয়ে রোদ তীব্র হবার পর পড়া হয়। আর আওয়াবীন সালাত মাগরিবের ফরজের পর পড়া হয়।

এ সালাত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে রাকাআত সংখ্যা নির্ধারিত নয়। ছয় রাকাআতের ফযীলত হাদীসে আসছে। আবার এর চেয়ে কমবেশিও করা যাবে।

হযরত হুযাইফা রাঃ থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ صَلَّى مع النبي صلعم المغرب، ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءُ "তিনি রাসূল সা. এর সাথে মাগরিব সালাত আদায় করলেন। ফরয শেষে তিনি নফল পড়তে লাগলেন এশা পর্যন্ত।

আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন,

مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا يَتَكَلَّمُ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سنة

"যে ব্যক্তি ছয় রাকাআত সালাত মাগরিবের পর পড়বে, যার মাঝে আল্লাহর জিকির ছাড়া কোন কথা বলে না, তাহলে সে বারো বছর ইবাদতের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।14

*** কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদের সালাত)**

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন সালাতকে তাহাজ্জুদ সালাত বলা হয়।

ফযীলত

তাহাজ্জুদের মর্যাদা অপরিসীম। ফরয সালাতের পরে উত্তম সালাত হলো- তাহাজ্জুদের সালাত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آناء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।

জান্নাতী মুমিন বান্দাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা রাত্রির শেষাংশে জাগ্রত থেকে সালাত পড়ে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের বর্ণনা দিয়েছেন যে,

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত।

নবী সা. বলেছেন,

أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

"ফরজের পর সর্বোত্তম সালাত হলো রাতের সালাত। 17

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

নিশ্চয় জান্নাতে কিছু কক্ষ রয়েছে যার বহির্ভাগ ভিতর থেকে দেখা যাবে এবং ভিতরের ভাগ বাইরে থেকে দেখা যাবে। এরপর এক বেদুইন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, এটি কার জন্য, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, যে ভালো কথা বলল, খাবার খাওয়াল, দিনের পর দিন রোজা রাখল এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আল্লাহর

উদ্দেশ্যে সালাত পড়ল। [তিরমিযী]

তাহাজ্জুদ সালাতের রাকাআত সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। তবে দুই দুই রাকাআত করে চার রাকাআত; থেকে শুরু করে যত রাকাআত ইচ্ছা আদায় করা যায়। উলামাদের পরামর্শ হলো- ন্যূনতম চার রাকাআত আদায় করা। যে কয় রাকাআতই পড়া হোক, তা নিয়মিত আদায়ের অভ্যাস করা।

যেমন হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেন, রমজানে নবীজীর সালাত কেমন হতো? তিনি উত্তরে বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে এবং রমজানের বাইরে এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে চার রাকাআত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না! এরপর আরও চার রাকাআত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা তো বলাইবাহুল্য! এরপর তিন রাকাআত (বিতির) পড়তেন।'

আরেক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি কাইস বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, নবীজী বিতরে কত রাকাআত পড়তেন? উত্তরে তিনি বলেন, চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন। তিনি বিতরে সাত রাকাআতের কম এবং তের রাকাআতের অধিক পড়তেন না।'

সুরা যুমার / আয-যারিয়াত 17-18

মুসলিম 22/38

** সহিহ বোখারি, ১/১৫৪*

আবু দাউদ: ১৮/১৯৩

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনও তাহাজ্জুদ সালাত চার রাকাআত পড়তেন, কখনও ছয় রাকাআত পড়তেন। কখনও আট রাকাআত পড়তেন। কখনও দশ রাকাআত পড়তেন। এরচেয়ে বেশি পড়া যাবে না, এমন নয়। যেহেতু এটি নফল সালাত, তাই যত বেশি পড়া যায় ততই সওয়াব।

*** কুসুফ (সূর্যগ্রহন) ও খুসুফ (চন্দ্রগ্রহন) এর সালাত**

কুসুফ হলো; সূর্যের আলো সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

খুসুফ চাঁদের আলো সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

কুসুফ ও খুসুফের হিকমত

এ দুটি আল্লাহ তাআলার নিদর্শন, যার দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান, যাতে তারা পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে যায়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিশ্চয় সূর্য ও চাঁদ কারও মৃত্যু অথবা জীবিত থাকার কারণে আলোহীন হয় না। এ দুটো বরং আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন, যার দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ভয় দেখান। অতঃপর যখন এ দুটোয় গ্রহণ লাগে তোমরা তখন সালাতের দিকে দ্রুত আগাও। (আবু দাউদ)

আবূ মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا

নবী (সা) বলেছেন, কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং সালাত আদায় করবে।

কুসুফ ও খুসুফের সালাতের সময়

কুসুফ ও খুসুফ শুরু হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত।

মুসল্লী তার সালাত পূর্ণ করে নেবে যদিও কুসুফ ও খুসুফ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আর যদি সালাত পড়ে শেষ করা হয়, কিন্তু কুসুফ ও খুসুফ বলবৎ থাকে তাহলে আবার সালাত আদায়ের প্রয়োজন নেই। বরং দুআ ও ইস্তিগফারে লিপ্ত থাকলেই চলবে।

সালাতের পদ্ধতি

দুই রাকাআত। এই সালাতের আযান-ইকামাত নেই। যদি সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ লাগে, তা হলে আসালাতু জামেয়া অর্থাৎ একত্রে সালাত আদায় হবে বলে সালাতের জন্য ডাক দিতে হবে। মানুষ যখন জমায়েত হবে তখন ইমাম তাদের নিয়ে দীর্ঘ কিরাতে সালাত পড়া সুন্নাত।

ইস্তিখারার সালাত

নতুন কোনো কাজ শুরু করার আগে ইস্তেখারা করতে হয়। এ জন্য কল্যাণ কামনায় ইঙ্গিত পেতে ইস্তেখারা নামাজ পড়া আবশ্যক। আরবি ইস্তেখারার অর্থ হলো- কল্যাণ প্রার্থনা করা বা এমন কিছু প্রার্থনা করা যাতে কল্যাণ রয়েছে। তাই কাজটি কল্যাণ হবে কিনা ইশারা-ইঙ্গিত পেতে ইস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাআত নামাজ ও দোয়া পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বিশেষ প্রার্থনাই হলো ইস্তেখারা।

ইস্তেখারা করার হুকুম:

ইস্তেখারা করা সুন্নাত। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুত্বসহকারে ইস্তেখারা করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে-

হজরত জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যেভাবে কুরআনের সুরা শেখাতেন; ঠিক সেভাবে (গুরুত্বের সঙ্গে) প্রতিটি কাজের আগে আমাদের ইস্তেখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) করার শিক্ষা দিতেন।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাযমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইস্তেখারা সম্পর্কে বলেন, 'ওই ব্যক্তি অনুতপ্ত হবে না; যে আল্লাহর কাছে ইস্তেখারা বা কল্যাণ কামনা করে, মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার উপর অটল-অবিচল থাকে।; কেননা আল্লাহ তাআলা পরামর্শের আলোকে কাজ করার কথা বলেছেন এভাবে-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

আর তুমি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে পরামর্শ কর। এরপর আল্লাহর উপর ভরসা করে (সিদ্ধান্তে অটল থাক)। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তার ওপর) ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন।' (সুরা আল-ইমরান: আয়াত ১৫৯) হজরত কাতাদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরে পরামর্শ করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সব চেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার তাওফিক দেন।'

ইস্তেখারা কখন করতে হয়

ইসলামের নির্দেশনা হলো যে কোনো নতুন কাজ শুরু করার আগে ইস্তেখারা করে নেওয়া। আর কোনো করতে গিয়ে যদি কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ইস্তেখারা করার বিকল্প নেই। সুন্নাতের অনুসরণে ইস্তেখারা করলে মহান আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইঙ্গিত প্রদান

করেন।। ১২

তাই নতুন যে কোনো কাজ কিংবা কাজের সঠিক সিদ্ধান্ত পেতে ইস্তেখারা কীভাবে করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন স্বয়ং বিশ্বনবি। সুতরাং বিয়ে-শাদী, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বিদেশ-সফরের বিষয়ে ইস্তেখারা করতে হয়।

ইস্তেখারা করার নিয়ম

যেহেতু ইস্তেখারা করা সুন্নাত। আর ইস্তেখারা মানুষের জন্য অনেক কল্যাণের। সেহেতু ইস্তেখারা করার জন্য উত্তম হলো-

১. নামাজের শুরুতে ভালোভাবে ওজু করে নেওয়া।

২. ইস্তেখারার উদ্দেশ্যে দুই রাকাআত নামাজ পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে সুরা ফাতেহার পরে যে কোন সূরা পড়া যায়।

৩. নামাজের সালাম ফেরানোর পর আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মর্যাদার কথা মনে করে একান্ত বিনয় ও

আন্তরিকতার সঙ্গে দোয়া পড়া। হাদিসে এসেছে-

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরজ নামাজ ছাড়া দুই রাকাআত নামাজ আদায় করে নেয়। এরপর (এই) বলে (দোয়া করে)-

،اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأسألك من فضلك الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنتَ عَلامُ الْغُيُوب، اللهم إن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الأمر شر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

(উল্লেখ্য যে, আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তালামু আন্না হাজাল আমরা (এখানে নিজের ইচ্ছা, কাজ বা পরিকল্পনার কথা বলা)

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্য চাইছি, তোমার শক্তির সাহায্য চাইছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহ চাইছি। তুমিই শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। তুমি অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী, আমার কোনো জ্ঞান নেই। তুমি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ও সম্যকভাবে জানো। হে আল্লাহ! তুমি যদি এ কাজটি আমার জন্য, আমার দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার জীবন যাপনের ব্যাপারে এবং আমার কাজের পরিণামের দিক থেকে অথবা আমার দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে ভালো মনে কর; তবে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দাও এবং আমার জন্য সহজ করে দাও। (বুখারি-৩২৫৩)

ইস্তেখারার জন্য কিছু জরুরী বিষয়:

১. ছোট-বড় সব বিষয়ে ইস্তেখারা করার অভ্যাস গড়ে তোলা সুন্নাতি আমল।

২. ইস্তেখারার বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ আপনাকে যে কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন তাতেই আপনার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই একান্ত মনোযোগ সহকারে স্থির চিত্তে এবং আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্বের কথা স্মরণ করে তার কাছে দোয়া করা।

৩. ইস্তেখারা তাড়াহুড়া না করা।

৪. যেসব সময়ে সাধারণ নফল নামাজ পড়া নিষিদ্ধ; সে সময়ে ইস্তেখারার নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকা।

৫. নারীদের ঋতুস্রাব (মাসিক) কিংবা সন্তান প্রসব জনিত রক্ত প্রবাহের (নেফাসের) সময় ইস্তেখারার নামাজ পড়া থকে বিরত থাকা। এ সময় নারীদের ইস্তেখারার প্রয়োজন হলে ভালোভাবে ওজু করে ইস্তেখারার নিয়তে শুধু দোয়া পড়া।

৬. ইস্তেখারার দোয়া মুখস্থ না থাকলে দেখে দেখে পড়া। তবে মুখস্থ পড়া ভালো।

৭. ইস্তেখারা করার পর নির্ধারিত বিষয়ের ওপর স্বপ্ন দেখা আবশ্যক নয়। স্বপ্নের মাধ্যমেও সঠিক জিনিসটি যেমন জানার সুযোগ আছে আবার নির্ধারিত বিষয়টির প্রতি মনের ঝোঁক বা আগ্রহও ইস্তেখারা বা কল্যাণের ইঙ্গিত।

৮. নির্ধারিত কাজের প্রতি মনের আগ্রহ বা ঝোঁক বেড়ে গেলে ইস্তেখারার ইঙ্গিত হিসেবে মেনে নিয়ে পরামর্শের আলোকে দৃঢ়ভাবে কাজে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

৯. ইস্তেখারার নিয়তে নামাজ পড়ার পরও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারলে একাধিকবার ইস্তেখারার নিয়তে নামাজ পড়াও বৈধ।

১০. ইস্তেখারার নিয়তে নামাজ পড়ার পড় হাদিসে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী দোয়া পড়া। তাতে কোনো শব্দ বাড়ানো বা কমানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

১১. ইস্তেখারার নিয়তে নামাজ ও দোয়ার পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি নিয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করাও উত্তম।

১২. যার কাজ তাকেই ইস্তেখারার নামাজ ও দোয়া পড়তে হবে। একজনের পক্ষে অন্যজন ইস্তেখারার নামাজ ও দোয়া করতে পারবে না।

*** সালাতুত তাসবীহ**

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আব্বাস ইবনে আ. মুত্তালিবকে বলেছেন, يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاه "ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أَفْعَلْ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنتَ فَعَلْتَ ذلِكَ، غَفَرَ اللهُ لكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ وَسِرَّهُ

وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ في أول ركعة، قلت وأنت قائم: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ فِي أربع ركعات، إن استطعت أن تُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً" হে চাচা! আমি কি আপনাকে দেব না? আমি কি আপনাকে প্রদান করব না? আমি কি আপনার নিকটে আসব না? আমি কি আপনার জন্য দশটি সৎ গুনের বর্ণনা করব না যা করলে আল্লাহ তাআলা আপনার আগের ও পিছনের, নতুন ও পুরাতন, ইচ্ছায় ও ভুলবশত কৃত, ছোট ও বড়, গোপন

ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন? আর সে দশটি সৎ গুন হলো: আপনি চার রাকাআত সালাত পড়বেন। প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। প্রথম রাকাআতে যখন কিরাআত পড়া শেষ করবেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫
বার বলবেন:
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
(সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার)
এরপর রুকুতে যাবেন এবঃ রুকু অবস্থায় (উক্ত দুআটি) ১০ বার পড়বেন। এরপর রুকু থেকে মাথা ওঠাবেন এবং ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদায় যাবেন। সিজদারত অবস্থায় ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন অতঃপর ১০ বার পড়বেন। এরপর আবার সিজদায় যাবেন এবং সিজদারত অবস্থায় ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদা থেকে মাথা ওঠাবেন এবং ১০ বার পড়বেন। এ হলো প্রতি রাকাআতে ৭৫ বার। আপনি চার রাকাআতেই অনুরূপ করবেন। যদি আপনি প্রতিদিন আমল করতে পারেন, তবে তা করুন। আর যদি না পারেন, তবে প্রতি জুমআআয় একবার। যদি প্রতি জুমআয় না করেন তবে প্রদি মাসে একবার। আর যদি তাও না করেন তবে জীবনে একবার।।২।
দ্বিতীয় রাকাআতে তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসবে তখন আগে উক্ত তাসবীহ ১০ বার পড়বে তারপর তাশাহহুদ পড়বে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকাআতের জন্য উঠবে। অতঃপর তৃতীয় রাকাআত ও চতুর্থ রাকাআতেও উক্ত নিয়মে উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। কোন এক স্থানে উক্ত তাসবীহ পড়তে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে বা ভুলে নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম পড়লে পরবর্তী যে রুকনেই স্মরণ আসুক সেখানে তথাকার সংখ্যার সাথে এই ভুলে যাওয়া সংখ্যাগুলোও আদায় করে নিবে। আর এই সালাতে কোন কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলে সেই সিজদা এবং তার মধ্যকার বৈঠকে উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে না। তাসবীহের সংখ্যা স্মরণ রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণনা করা যাবে না, তবে আঙ্গুল চেপে সুস্মরণ রাখা যেতে পারে।

*** সালাতুল হাজত**

যখন কেনো মানুষের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দিবে, তখন তার জন্য সালাতুল হাজত পড়া মুস্তাহাব।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাখি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضا وليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم "যে ব্যক্তির আল্লাহর নিকট কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে, বা কোনো মানুষ সম্পর্কিত কোনো প্রয়োজন দেখা দিবে,সে যেন উত্তম রূপে অজু করে, অতঃপর দু' রাকাআত সালাত পড়ে। সালাতের পর আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা এবং নবী সাঃ এর ওপর দুরুদ পাঠ পূর্বক নিম্নোক্ত দু'আকে যেন সে পড়ে নেয়।"

لا إله إلا الله الحَلِيمُ الكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بر، والسلامة من كل إثم، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هي لك رضا إلا قضيتها يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

সালাতুল ইস্তেসকা

ইস্তিস্কা অর্থ: পান করার জন্য পানি প্রার্থনা করা। শারঈ পরিভাষায় ব্যাপক খরা ও অনাবৃষ্টির সময় বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে পানি প্রার্থনা করাকে 'ছালাতুল ইস্তিস্কা' বলা হয়। ৬ষ্ঠ হিজরীর রামাযান মাসে সর্বপ্রথম মদ্বীনায় ইস্তিসকার ছালাতের প্রবর্তন হয়। (মির'আত ৫/১৭০) মলিন ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে চাদর গায়ে দিয়ে বিনয়-নম্র চিত্তে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হবে। সাথে ইমামের জন্য মিম্বর নিতে পারবে। অতঃপর নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বনে ইস্তিসকার ছালাত আদায় করবে।

সালাত আদায়ের নিয়ম:

ঈদের ছালাতের ন্যায় আযান ও ইকামত ছাড়াই প্রথমে জামা'আত সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। (আবুদাউদ হা/১১৬১)

ইমাম সরবে কিরাআত করবেন। প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা গাশিয়াহ কিংবা অন্য যে কোন সূরা পড়বেন। অতঃপর ছালাত শেষে ইমাম মিম্বরে বসে বা দাঁড়িয়ে অথবা মিম্বর ছাড়াই মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহু আকবর, আলহামদু লিল্লাহি রবিবল 'আলামীন ওয়াছ ছালাতু ওয়াসসালামু 'আলা রাসূলিহিল কারীম' বলে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ শেষে মুছল্লীদের প্রতি ইস্তিসকার গুরুত্ব সম্পর্কে ঈমান বর্ধক উপদেশসহ সংক্ষিপ্ত খুৎবা দিবেন। (বুখারী -১০২২)

অতঃপর ইমাম ও মুক্তাদী সকলে কিবলামুখী দাঁড়িয়ে স্ব স্ব চাদর উল্টাবে। অর্থাৎ চাদরের নীচের অংশ উপরের দিকে উল্টে নিবেন এবং চাদরের ডান পাশ বাম কাঁধে ও বাম পাশ ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর দু'হাত উপুড় অবস্থায় সোজাভাবে চেহারা বরাবর উঁচু রাখবে, যেন বগল খুলে যায়। (মিশকাত-১৫০৪, ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১৬১
অতঃপর নিম্নের দো'আ সমূহ পাঠ করবেন-
#(তিরমিষ্টি-৪৭৯
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّين، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنتَ الْغَنِي وَنَحْنُ الْفُقَرَاء، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَ بَلَاغًا إِلَى حِينٍ

অনুবাদ: সকল প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য। যিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। যিনি বিচার দিবসের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই-ই করেন। হে প্রভু! আপনি আল্লাহ। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আপনি মুখাপেক্ষীহীন ও আমরা সবাই মুখাপেক্ষী। আমাদের উপরে আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করুন! যে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তা যেন আমাদের

জন্য শক্তির কারণ হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ লাভে সহায়ক হয়'। (আবুদাউদ, মিশকাত: ১৫০৮)

اللهم اسق عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاحْيِ بَلْدَكَ الْمَيِّتَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি পান করান আপনার বান্দাদেরকে ও জীবজন্তু সমূহকে এবং আপনার রহমত ছড়িয়ে দিন ও আপনার মৃত জনপদকে পুনর্জীবিত করুন'। (মুওয়াত্ত্বা, আবুদাউদ, মিশকাত-১৫০৬)

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَّرِيئًا مريعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارَ عَاجِلا غير اجل

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন, যা চাহিদা পূরণকারী, পিপাসা নিবারণকারী ও শস্য উৎপাদনকারী। যা ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী এবং যা দেরীতে নয় বরং দ্রুত আগমনকারী'। (আবুদাউদ, মিশকাত-১৫০৭)
এই সময় বৃষ্টি দেখলে বলবে, اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন)। (বুখারী -১০৩২)
বৃষ্টিতে চাদর ভিজিয়ে আল্লাহর বিশেষ রহমত মনে করে আগ্রহের সাথে তা বরণ করে নিতে হবে। চাদর উল্টানোর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যেন খরা উল্টে গিয়ে বৃষ্টিপাত হয়। এছাড়াও রয়েছে রাজাধিরাজ আল্লাহর সামনে বান্দার পরিবর্তিত অসহায় অবস্থার ইঙ্গিত। দাঁড়িয়ে দু'হাত উপুড় ও সোজাভাবে ধরে রাখার মধ্যে রয়েছে পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ ও একান্তভাবে আত্মনিবেদনের ইঙ্গিত। ময়দানে বেরিয়ে একত্রিত হয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার মধ্যে রয়েছে একই বিষয়ে হাযারো বান্দার ঐকান্তিক প্রার্থনার গুরুত্ববহ ইঙ্গিত।

ষষ্ঠ অধ্যায় : নামাজ এবং বাস্তবতা

একবার ইসলামিক সমাবেশে একজন উস্তাদকে এক ছাত্রী জিজ্ঞেস করল, 'আমি কীভাবে আমার নামাজের প্রতি আরো মনোযোগী হতে পারি?' উস্তাদের উত্তরটা ছিল ভিন্নধর্মী কিন্তু চমৎকার! তিনি বললেন, 'দিনের রুটিনগুলোকে গোছানোর শুরুতে সব সময় নামাজকে সবার আগে প্রাধান্য এবং গুরুত্ব দিবেন।' কিন্তু আমরা করি উল্টো। আমরা অফিস, স্কুল, রান্নাবান্না ইত্যাদি সব কাজের সময়গুলো দিনের রুটিনের মধ্যে বসিয়ে সামান্য একটু সময় বাকি থাকলে সেটা নামাজের জন্য রেখে দিই।
অথচ আমাদের উচিত নামাজের সময়গুলোকে সবার আগে দিনের রুটিনে বসিয়ে, এরপর যে সময়টুকু বাকি রইল সেখানে দিনের অন্য সব কাজ, দায়-দায়িত্বের অংশগুলো সেট করা।

Make your daily routine around the salah, do not make your salah go around your daily routine.
(অর্থাৎ নামাজকে ঘিরে আপনার প্রতিদিনের রুটিন তৈরি করুন, আপনার রুটিনকে ঘিরে নামাজের সময় কোনোমতে বের করবেন না।)
খুব পাওয়ারফুল একটা কথা! আমরা যদি ছোটবেলা থেকে সবার আগে নামাজের জন্য পাঁচটা সময় নির্ধারণ করতাম অথবা দিনে নামাজের বাইরের সময়টাতে অন্যান্য কাজগুলো ভাগ করে দিতাম, তাহলে আমরা নামাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া শিখতাম। এবং কখনোই আমাদের কাছে নামাজকে কোনো অতিরিক্ত কাজ বলে মনে হতো না। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই কঠিন!
সন্ধ্যার সময়ে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম আর মাগরিবের নামাজটা কাযা হয়ে গেল। 'বাসায় গিয়ে পড়ে নিব' এই ধোঁকায় নামাজের সময় শেষ! একটা বিয়ের দাওয়াতে গেলাম আর এশার নামাজটা কাযা করে আসলাম। যদি ভ্রমণের মধ্যে নামাজে মন ফেরানো ও থাকি তাহলে ক্লান্তি এবং ঘুমে জড়িয়ে সবার আগে নামাজের কথা ভুলে যাই। কোনো পাবলিক প্লেস, শপিং মল, পিকনিক অথবা মার্কেটে গেলে কেনাকাটার ফাকে নামাজের ওয়াক্ত কোন ফাঁকে শুরু হয়ে কোন ফাঁকে শেষ হয়ে যায় সেটা টেরই পাই না। নামাজটা আমাদের কাছে যেন ঐচ্ছিক কিছু, আস্তাগফিরুল্লাহ। যেহেতু আমাদের এই ভিত্তিটাই নড়বড়ে, সেহেতু আমাদের জীবনের অধ্যায়ই নড়বড়ে অবস্থায় রয়ে যায়। নামাজ কায়েম করতে হবে এটা সবাই জানি। কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেন আমরা নামাজকে ধারণ করার সময়ে আমরা পিছিয়ে যাই। সেক্ষেত্রে দৃঢ়তা বজায় রাখতে কিছু বাস্তবিক চর্চার কথা বলছি, ইনশাআল্লাহ; এর সবগুলো

■ এক. সব সময় নিজের সাথে একটা বহনযোগ্য ছোট জায়নামাজ নিয়ে রাখা। এখন দেশীয় বিভিন্ন অনলাইন শপগুলোতে ছোট কাপড়ের জায়নামাজ পাওয়া যায় যেগুলো ছোট রুমালের মতো ভাজ করে পকেটে রেখে দেয়া যায়। দোকানে পাওয়া না গেলেও নিজের জন্য একটা ছোট জায়নামাজ বানিয়ে নেয়াটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। অথবা জায়নামাজ না থাকলে ছোট একটা পরিষ্কার কাপড় বা ওড়না ব্যাগের মধ্যে রাখলেও চলবে। যেন যে যখন যে অবস্থাতেই থাকি না কেন নামাজের সময় হলে সেটা বিছিয়ে নামাজ পড়া যায়।
দুই. যেকোনো সাপ্তাহিক/মাসিক রুটিন করার সময়, কোনো আয়োজন বা অনুষ্ঠান অথবা বাইরে বের হবার পরিকল্পনা করার সময়, নামাজের কথা সর্বপ্রথম মাথায় রাখা এবং সবার আগে নামাজটা কোথায়, কখন, কীভাবে পড়া হবে সেটা ঠিক করে নেয়া। ওযু করে নেয়া অথবা কোথায় ওযু করা হবে সেটাও ঠিক করে নেয়া। অনেকে বুদ্ধি করে সকাল সকাল বের হয়ে কাজ সেরে চলে আসেন যেন কোনো নামাজের ওয়াক্ত পথের মধ্যে না পড়ে যায়।
তিন. একটা দারুণ ব্যাপার হচ্ছে, এখন বাংলাদেশের বেশ কিছু শপিংমল এবং মার্কেটে মহিলাদের এবং পুরুষদের জন্য আলাদা নামাজ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সেজন্য

যদি কোনো কাজে মার্কেটে যেতে হয় তাহলে এমন মার্কেট অথবা শপিংমল বাছাই করে নেয়া যেখানে আলাদা নামাজ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

চার. আমার এক পরিচিত ভাই আছে যিনি যখনই কোনো নতুন প্রজেক্ট অথবা চাকরিতে একটা নতুন কোনো গ্রুপের সাথে কাজ করা শুরু করেন, তিনি সবাইকে জানিয়ে দেন যে, আমি মন লাগিয়ে পুরোটা সময় কাজ করব। কিন্তু যখন নামাজের সময় আসবে তখন আমাকে আপনারা পাবেন না। নামাজ পড়া শেষ করে তবেই আমি আবার কাজে ফেরত আসব ইনশাআল্লাহ। সুবহানআল্লাহ! শুধু তার এই ইতিবাচক মানসিকতা ও দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ তাআলা তার রিযিক, জীবন এবং চাকরিতে যে পরিমাণ বরকত এবং রহমত দিয়েছেন তা আমার নিজের চোখে দেখা আলহামদুলিল্লাহ। তিনি এ ব্যাপারে সব সময় অটল এবং অনড় ছিলেন দেখে সব ক্ষেত্রে মানুষও তাকে সম্মান করতেন। যখন আপনি দুনিয়ার মানুষের সন্তুষ্টির চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বেশি প্রাধান্য দিবেন, তখন আল্লাহ আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনেই সম্মান দিবেন।

■ পাঁচ. আপনি নতুন চাকরীতে জয়েন করেছেন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, এই পরিস্থিতিগুলোতে সবার আগে খুজে বের করুন নামাজের কোনো ঘর আছে কি না? একটু খোঁজ খবর নিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন তাগাদা সহকারে। এই জায়গাটা খুঁজে রাখলে, ওয়াক্ত হলে সহজেই সেখানে গিয়ে নামাজ পড়া যাবে।

ছয়. যদি একান্তই কোনো "নামাজ ঘর" এর মতন জায়গা পাওয়া না যায়, তাহলে যতটুকু সম্ভব একটি কর্নারে কোনো মানুষের কাজের মধ্যে অথবা যাওয়া-আসা পথের মধ্যে না পড়ে এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করে দিবেন। তবুও নামাজ বাদ দেয়া যাবে না।

সাত. আমাদের দেশে বিয়েতে আনুষ্ঠানিকতার নামের যে পরিমাণ অবাধ্যতা এবং নির্লজ্জতার উৎসব চলে সেখানে সব কিছু করার কথা মনে থাকলেও নামাজের কথা ভুলে যাওয়া হয়। এমন কোথাও বিয়ের যাওয়ার আমন্ত্রণ থাকলে আগে থেকেই হলরুমে অথবা সেন্টারে কোনো নামাজের জায়গা আছে কিনা সেটা কাউকে জিজ্ঞেস করে নিবেন। অথবা ওয়াক্তের মধ্যে পড়লে বাসা থেকে আগেই নামাজ পড়ে তারপর বের হবেন।

যদি বিয়েটা নিজেরই হয়, সেক্ষেত্রেও নানান ব্যস্ততার এবং হুলস্থুলের মধ্যে আপনি যেন আপনার নামাজের ওয়াক্ত মোটেও ভুলে না যান সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন।

অবশ্যই মুক্তা, নিচে **"নামাজ বনাম অন্যান্য ইবাদত: মর্যাদা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ"** শিরোনামে একটি আলিম পর্যায়ের অধ্যায় তুলে ধরা হলো:

সপ্তম অধ্যায় :নারী ও শিশুদের নামাজ শিক্ষা

ইসলামে সালাত সকল বালেগ নর-নারীর ওপর ফরজ। নারী ও শিশুদের নামাজ শিক্ষা দেওয়াকে শরীয়ত অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ, একটি দ্বীনদার প্রজন্ম গড়তে হলে শিশুদেরকে ছোটবেলা থেকেই সালাতের অনুশীলনে অভ্যস্ত করতে হয় এবং নারীদের সঠিকভাবে সালাত শিখানো জরুরি, কারণ তারাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রথম মাদরাসা।

২. নারীর ওপর সালাত ফরজ হওয়ার প্রমাণ

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

“তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করো।”

(সূরা আহযাব: ৩৩)

এই আয়াত নারীদের উদ্দেশ্যেও নাযিল হয়েছে। সালাত নারীদের জন্যও পুরুষদের মতোই ফরজ।

জামাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ :

মহিলাদের মসজিদের জামাআতে শামিল হওয়ার চাইতে স্বগৃহে; বরং গৃহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অন্দর মহলে নামায পড়াই হল উত্তম। মহানবী)ﷺ(বলেন, "মহিলাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মসজিদ তার গৃহের ভিতরের কক্ষ।" (আহমাদ, মুসনাদ, হাকেম, মুস্তাদরাক ১/২০৯, বায়হাকী, জামে ৩৩২৭নং)

তিনি বলেন, "মহিলা স্বগৃহে থেকে তার রবের অধিক নিকটবর্তী থাকে।” (ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ, ত্বাবারানীরানী, মু'জাম, সহিহ তারগিব ৩৩৯, ৩৪১নং)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, "মহিলা তার ঘরে থেকে রবের ইবাদত করার মত ইবাদত আর অন্য কোথাও করতে পারে না।" (ত্বাবারানী, মু'জাম, সহিহ তারগিব ৩৪২নং)

মহিলাদের জন্য মসজিদ বা ঈদগাহে জামা'আতে নামায পড়তে যাওয়া মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। সাহাবাদের যুগ থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা চলে আসছে। তবে কখনও যদি স্বামী, পিতা বা ছেলে প্রমুখ মাহরাম পুরুষ ঘরে জামাআতের সাথে নামায পড়েন, তাহলে তাদের পিছনে এক্তেদা করে নামায পড়তে পারবে। মহিলাগণ ইমামতি করতে পারেন না।

শিশুদের নামাজ:

ছোট বাচ্চারা অনেকটা কাদামাটির মতো। আপনি যেভাবে তাদেরকে গড়ে তুলবেন, তারা ঠিক সেভাবেই গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

সেজন্য ছোটবেলা থেকেই তাদের অন্তরে নামাজের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। অনেক মা-বাবাই বাচ্চাদের পড়াশোনা এবং কর্মজীবনের সাফল্য নিয়ে ছোটবেলা থেকেই প্রচণ্ড সচেতন থাকেন। কিন্তু তাদের নামাজ, কুরআন, দ্বীন শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে ঠিক ততটাই গাফেল রয়ে যান। দেখা যায় স্কুলের পড়াশোনার জন্য তাদের একের পর এক কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিচার, টিউটর ইত্যাদির কাছে ভর্তি করিয়ে দেয়া হচ্ছে। সকাল ছয়টায় উঠিয়ে বাচ্চাদের কোচিংয়ের জন্য, স্কুলের জন্য রেডি করে দিচ্ছে। কিন্তু ঠিক একই সময়ে যদি ফজরের জন্য তাদেরকে উঠতে বলার কথা ওঠে, সেক্ষেত্রে মা-বাবারাই গড়িমসি করেন। উলটো মা-বাবারাই হয়তো অনেক ক্ষেত্রে বলেন যে, 'থাক আজকে, একটু ঘুমাক। এখন তাদের পরীক্ষা চলছে!'

সুবহানাল্লাহ! আপনি কখনো সহ্য করতে পারবেন যদি আপনার চোখের সামনে আপনার সন্তানকে আগুনে ছুড়ে ফেলা হয়? তাহলে কীভাবে তাদের নামাজের ব্যাপারে, দ্বীনের ব্যাপারে আমরা এতটা গাফেল থাকতে পারি? যে রকমের গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠিয়ে স্কুলের জন্য রেডি করা হয়, ঠিক একই রকমের গুরুত্ব দিয়ে যদি তাদেরকে ছোটবেলা থেকেই ফজরের নামাজের জন্য রেডি করা হতো, তাহলে সেই ছোটবেলা থেকেই বাচ্চারা বুঝত যে, দুনিয়ার থেকে দ্বীন বড়!

কিছু প্রাক্টিক্যাল টিপস

বাচ্চারা তাদের চোখ দিয়ে শোনে অর্থাৎ, তারা চোখে মা-বাবাকে যেটা করতেদেখবে সেটাই তারা কান দিয়ে অর্ডার হিসেবে শুনবে এবং অনুকরণ করবে।

সেজন্য বাচ্চাকে যদি নামাজের প্রতি মনোযোগী করতে চাই সবার আগে মা-বাবাকে নামাজের প্রতি মনোযোগী হয়ে উদাহরণ হিসেবে বাচ্চাকে দেখাতে হবে।

মা-বাবা যখন নামাজে দাঁড়াবে তখন ছোট বাচ্চাটাকে একপাশে নিয়ে দাঁড়াবে। যদি বাচ্চা দাঁড়াতে না চায় অন্তত বাচ্চাকে আশেপাশে রাখবে যেন বাচ্চা সবসময় মা বাবাকে নামাজ পড়তে দেখতে দেখতে বড় হয়।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে রুপকথার আকাশ-পাতাল গল্প না শুনিয়ে বাচ্চাদেরকে সাহাবী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঈমানদীপ্ত দ্বীনের খেদমত, সাহসিকতা এবং নামাজের গল্প শোনাবেন। যেটা সঙ্গতিপূর্ণ হবে, সেই অনুযায়ী বাচ্চাদের সাথে নামাজের বিভিন্ন তাসবীহ, সূরা ইত্যাদি মুখস্থ করাতে করাতে রাত্রিবেলা ঘুমাতে যাবেন।

একটা সত্য ঘটনা বলি। এক পরিচিত ভাইয়ের ৬ বছরের বাচ্চা একদিন

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভীষণ কান্না জুড়ে দিল। সকাল আটটার দিকে ঘুম থেকে উঠে কিছুতেই তার কান্না থামানো যাচ্ছে না। কেন কাঁদছে জিজ্ঞেস করতে সে বলল যে, তার ফজরের নামাজ কাযা হয়ে গিয়েছে। এইজন্য সে পাগলের মতো কাঁদছে। তার ভয়াবহ রকমের কান্না দেখে মা এবং দাদি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। দাদি বউমাকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'তুমি আমার বাচ্চাকে কী সব শুনিয়ে ভয় দেখিয়েছ? এরকম অসুস্থ বাচ্চার মতো কাঁদছে কেন?' মা নিজেও কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেলেন। বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আব্বুসোনা, তুমি কি আসলেই নামাজের জন্য এভাবে কাঁদছ? না কি অন্য কোনো সমস্যা হয়েছে? আমাকে বলো।' তখন বাচ্চাটা তার মাকে বলল যে, 'আমি অবশ্যই নামাজের জন্য এভাবে কাঁদছি। কারণ, আমি যখন আমার বাবাকে একদিন ফজরের নামাজ কাযা হয়ে যেতে দেখেছিলাম, তখন বাবাও এভাবেই কেঁদেছিলেন।' সুবহানআল্লাহ! এই বাচ্চাটা তার নিজের চোখ দিয়ে যা দেখেছে সেটা তার সারা জীবন রিমাইন্ডার হিসেবে মনে থাকবে। তার বাবার এই আন্তরিক অশ্রু ঝরানোর দৃশ্য তার অন্তরে যেভাবে নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে দাগ কেটে দিয়েছে, সেভাবে অন্য কোনো শাসন হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে না!

বই :নামাজে মন ফেরানো

অষ্টম অধ্যায়: নামাজ বনাম অন্যান্য ইবাদত — মর্যাদা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইসলামে ইবাদতের বিভিন্ন রূপ রয়েছে—যেমন সালাত, রোযা, যাকাত, হজ, কুরআন তিলাওয়াত, দোআ, জিকির ইত্যাদি। তবে সকল ইবাদতের মাঝে নামাজের স্থান সবচেয়ে উঁচু। এ অধ্যায়ে আমরা সালাতের মর্যাদা ও তা অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় কেন শ্রেষ্ঠ—তা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করবো।

১. সালাত: দ্বীনের স্তম্ভ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد."

"পুরো দ্বীনের কেন্দ্রবিন্দু ইসলাম, এর স্তম্ভ সালাত এবং সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ।" (তিরমিজি: ২৬১৬)

সালাত হলো এমন এক ইবাদত, যা ছাড়া ইসলামের কাঠামো দাঁড়ায় না। রোযা, হজ, যাকাত—সবই সালাতের পরে।

২. সালাত ও রোযা: তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

- রোযা বছরে এক মাস ফরজ; সালাত প্রতিদিন পাঁচবার ফরজ।
- রোযার বিধান কেবল দিনের নির্দিষ্ট সময়ে, কিন্তু সালাত দিন-রাতের পাঁচ সময়।
- রোযা আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়, আর সালাত শেখায় আত্মশুদ্ধি, খোদাভীতি এবং ক্বিয়ামুল লায়ল।

৩. সালাত ও যাকাত: একটি আধ্যাত্মিক, অন্যটি আর্থিক

- যাকাত অর্থসম্পদের বিশুদ্ধি, আর সালাত আত্মার বিশুদ্ধি।
- যাকাত নির্দিষ্ট পরিমাণ ধনীদের ওপর ফরজ; সালাত প্রত্যেক বালেগ মুসলমানের ওপর।

৪. সালাত ও হজ: নিয়মিত বনাম এককালীন ইবাদত

- হজ জীবনে একবার ফরজ (যাদের সামর্থ্য আছে), আর সালাত প্রতিদিন।
- হজে রয়েছে শারীরিক, আর্থিক ও সামাজিক উপাদান; সালাতে রয়েছে স্থায়ী আত্মিক সংযোগ।

৫. সালাত ও দোআ-জিকির: আন্তরিকতা ও নিয়মমাফিকতা

- দোআ ও জিকির স্বেচ্ছাধীন ইবাদত; সালাত নির্ধারিত নিয়ম ও সময়ের বাধ্যতামূলক ইবাদত।
- সালাতের মাঝে রয়েছে দোআ, জিকির, তিলাওয়াত—অর্থাৎ সালাত অনেক ইবাদতের সমন্বয়।

৬. সালাত: জান্নাত ও জাহান্নামের নির্ধারক

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ *قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴿

"তোমরা জাহান্নামে কীভাবে পড়লে? তারা বলবে, 'আমরা নামাজ আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।'"

(সূরা মুদ্দাসসির: ৪২-৪৩)

এ আয়াত প্রমাণ করে—নামাজ ইবাদতের মধ্যে এমন একটি স্তম্ভ, যার পরিত্যাগ ঈমান থেকেই বিচ্যুতি ঘটাতে পারে।

সব ইবাদতই গুরুত্বপূর্ণ, তবে সালাতের মর্যাদা সবার উপরে। এটি দ্বীনের মূল স্তম্ভ, ঈমানের প্রমাণ এবং আখিরাতের সফলতার চাবিকাঠি। তাই যে ব্যক্তি সালাত প্রতিষ্ঠা করে, সে সকল ইবাদতের মর্ম বুঝে। আর যে তা ছেড়ে দেয়, সে ধীরে ধীরে সকল ইবাদত থেকে দূরে সরে পড়ে।

নবম অধ্যায় : মনের মত সালাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে বসে আছেন। ইতোমধ্যে একজন সাহাবী মসজিদে ঢুকে নামাজ পড়ে নবীজির কাছে এসে সালাম দিলেন। নবীজি বললেন, 'যাও, তুমি আবার নামাজ পড়ে এসো। তোমার নামাজ হয়নি।' সাহাবী গিয়ে আবার নামাজ পড়ে নবীজির সামনে এলেন। তিনি এবারও বললেন, 'তোমার নামাজ হয়নি, আবার পড়ে এসো।' তৃতীয়বারে এসে সাহাবী অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এর চেয়ে সুন্দর করে আমি নামাজ পড়তে পারি না। দয়া করে আমাকে শিখিয়ে দিন।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'শোনো, প্রথমে নামাজে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়াবে। তারপর কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয়, তা পাঠ করবে। রুকু করবে, রুকুতে শান্ত হয়ে যাবে। রুকু শেষে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্থির হবে। এরপর সিজদা দিবে, সিজদাতে গিয়েও স্থিরতা বজায় রাখবে। সিজদার পর স্থির হয়ে বসবে। এভাবেই পুরো নামাজ শেষ করবে। ১৮৬]

একটু কি ভেবে দেখবেন, আপনি যখন রুকু কিংবা সিজদা করেন, তখন কি

---

[১৮৬] বুখারী, মুসলিম

মনের ভুলেও কখনো খেয়াল করেন যে, আপনি কার সামনে রুকু করছেন। কার সামনে লুটিয়ে পড়ছেন সিজদায়?

জীবনে কবরের সিজদা দেখেছেন? আজকাল ইন্টারনেটে পীরের সামনে সিজদার দৃশ্য দেখা যায়। খেয়াল করে দেখবেন, পীরের সামনে যে নির্বোধরা সিজদা করে, তাদের মাঝে কোনো

তাড়াহুড়ো থাকে না। কাকের মতো ঠোকর দিয়েই ওঠে না। জানে পীর বাবা তার সামনে আছে, বেয়াদবি করা যাবে না। কবরে যখন সিজদা করে খটাস করে মেরে উঠে পড়ে না কি? প্রতিমার সামনে সিজদা দেখেছেন কখনো? খটাস করে মেরে উঠে পড়ে না কি?

আমাদের কী দুর্ভাগ্য! কবরপূজারি কবরে গিয়ে কত ভক্তি নিয়ে সিজদা করে পড়ে থাকে। পীরের পূজারি কত আবেগ নিয়ে শ্রদ্ধার সাথে সিজদা দিয়ে পড়ে থাকে।

প্রতিমাপূজারি প্রতিমার সামনে কত আবেগ আর ভালোবাসা নিয়ে সিজদা দিয়ে পড়ে থাকে। আর আল্লাহর উপাসকরা আল্লাহর সামনে সিজদা দেয়ার সময় চট করে উঠে পড়ে। এই আমাদের ঈমান ভাইয়েরা! এমনই কি হওয়া উচিত ছিল ভাইয়েরা! আমি তো নামাজ পড়ছি আল্লাহকে সিজদা করার জন্য। নামাজে আমার মাবুদকে সিজদা করব, আমার মনের কথা বলব। কিছু না পারি, আরবী এক হরফ পারি বা না পারি, সিজদায় গিয়ে তো পড়ে থাকা যায়! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন রুকু করবে শান্ত হয়ে যাবে।' আমরা আল্লাহর সামনে নত হয়ে নিজের দাসত্ব প্রকাশের জন্যই তো নামাজে দাঁড়িয়েছি। কিচ্ছু পারিনি, সব মাফ। কিন্তু মাথাটা নিচু করে রুকুতে গেলাম আর যান্ত্রিকভাবে দ্রুততার সাথে রুকুর তাসবীহ পড়লাম। তারপর দেখা যায় দুঃখজনক দৃশ্য। অধিকাংশ মুসল্লি পুরো সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেবের আগেই সিজদাতে চলে যায়। আর একাকী নামাজির অবস্থা তো আরো নাজুক। যখন একা একা সুন্নাত পড়া হয়, রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে যেন রুকু থেকেই সিজদায় চলে যাচ্ছে। তাহলে 'সামিআল্লা হুলিমান হামিদা' কখন পড়ল? অনেকে দাঁড়ানোর ভাব নিলেও সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই সিজদায় চলে যায়।

বিশ্বাস করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

[১৮৭] খুব দ্রুত কাজ করা

"যে ব্যাক্তি রুজু সিজদা চুরি করে এইভাবে খেয়ালহীন এবং মোরগের মতো ঠোকর দিয়ে নামাজ পড়ে সে আমার উম্মত হয়ে মরতে পারবে না।'

নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে আপনার অনেক কিছুই মাফ হতে পারে। কিছু সময় এমন আছে, কাপড় পাক নেই মাফ, ঢাপ নেই মাফ, ওযু নেই, মাফ। যখন আপনি সিজদায় মাথা নোয়ালেন, তখন কেন পড়ে থাকলেন না। কী আপনার? অভিযোগ ছিল

সব সময় একটা কথা মনে রাখতে হবে, নামাজ আমার সবচেয়ে বড় ইবাদত, আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে আমার মূল মারিফত, মূল তরিকত, মূল সেতুবন্ধন। সেই ইবাদতে আর কিছু না পারি, আমি যে আমার মাবুদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমার মাবুদ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, আমার অন্তর তিনি দেখছেন, আমার চোখ তিনি দেখছেন, আমার ইবাদত দেখছেন। সেই মাবুদের সামনে আমি অন্তত একটু সময় নিয়ে দাঁড়াই।

দেখুন, আমরা অনেকেই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি সূরা-কিরাত ঠিকমতো পড়তে পারি না, ভুলে যাই। এটা হতেই পারে। কিন্তু 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' তো ভুলে যাওয়ার কথা না। তাহলে অন্তত

রুকুতে গিয়ে অন্তরে আল্লাহর মহব্বত নিয়ে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করুন।

মানুষ পীরের সামনে মাথা নত করে সিজদা করে কত কথা বলে। পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ কান্না করে কত কথা বলে। আর আপনি আল্লাহর সামনে মাথা নত করে কান্না করতে পারেন না, তাহলে আপনি আল্লাহর কেমন বান্দা হলেন!

কাজেই আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশের জন্য রুকু-সিজদা সুন্দর করার কোনো বিকল্প নেই। রুকু থেকে উঠে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলুন,

'রাব্বানা লাকাল হামদ, হামদান কাসিরান ত্বাইয়্যিবান মুবারাকান ফী-হি।' আর কিছু জানা না থাকলে অন্তত এই কথাগুলো সুন্দর করে বলুন। তাও না পারলে অন্তত পুরো সোজা হয়ে- মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ান, শান্ত হয়ে দাঁড়ান।

আপনি যখন প্রধানমন্ত্রী কিংবা ডিসির সামনে দাঁড়ান, তখন খুব অস্থির হয়ে দাঁড়ান না কি? খুব সচেতন ও মিনতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, যেন দৃষ্টিকটু কিছু নামাজে মন ফেরানো ২৪৪

আপনার আচরণে প্রকাশ না পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য! আপনি আপনার মাবুদের সামনে তীব্র অস্থিরতা নিয়ে দাঁড়ান।

কাজেই রুকুতে গিয়ে শান্ত হোন এবং রুকুতে আল্লাহর সাথে কথা বলতে শিখুন। জীবন তো শেষ করে দিলেন বউ-বাচ্চা, পড়ালেখা আর ডিগ্রি নিয়ে। অনেকে রবের কাছে প্রার্থনার মধুর স্লোগান তুলে নামাজে আরবী ভিন্ন মাতৃভাষা প্রয়োগের ফতোয়া দিয়ে থাকেন। আমি তাদের সুবোধ কামনা করছি। তাদের কথা ভাবলে বড্ড লজ্জা আর অবাক লাগে। এরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বহু বছর সময় নিয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছে। এই ডিগ্রির খাতিরে অনেক সময় ব্যয় করে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেছেন, এতে সমস্যা হয়নি। যখন রবের সাথে একটু কথা বলার জন্য আরবী শেখার প্রসঙ্গ আসে তখনই গাত্রদাহ শুরু হয়। ধিক জানাই নামাজের প্রতি এই অবহেলাকে এবং এই নিচু মানসিকতা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার চিন্তাকে। নশ্বর এই দুনিয়ার জন্য রাতের পর রাত জেগে ইংরেজি শিখতে পারেন, আর আল্লাহর জন্য সামান্য সময় ব্যয় করে আরবী শিখতে পারেন না, এই লজ্জার কথা বলি কী করে? আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করুন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে বিভিন্ন দুআ পড়তেন। দুআগুলো ছোট ছোট কিন্তু মজার এবং আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্ত্ব প্রকাশক। যেমন, তিনি বলতেন, 'সুবুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ।'

হাদিসে আছে, রুকুতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন,

،اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي
وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي

আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা'তু, ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আলামতু। খাশা'আ লাকা সাম'ঈ ওয়া বাসারী ওয়া মুখখী ওয়া 'আযমী ওয়া 'আসাবী ওয়ামাস্তাফাল্লাত বিহি কাদামী। **১৮৮১**

যার অর্থ হলো,'হে আল্লাহ, তুমি মহাপবিত্র, তোমার কাছে আমি নত হয়েছি। তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি আমি। তোমার জন্য বিনম্রতায় নত হয়েছে আমার কান, আমার চোখ, আমার বোধ, আমার অস্থি, আমার সকল অনুভূতি।'

[১৮৮] মুসলিম ১/৫৩৪

রুকুতে গিয়ে তিনি আরো বলতেন

سُبْحَانَ ذِي الْجِبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ

সুবহা-নাযিল জাবারূতি ওয়াল মালাকৃতি ওয়াল কিবরিয়া'ই ওয়াল
'আযামাতি। [১৮৯]

'পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি সেই সত্তার, যিনি প্রবল প্রতাপময়, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব-গরিমা এবং অতুলনীয় মহত্ত্বের অধিকারী।'

এগুলো পড়তে শিখেন, বেশি না মাত্র কয়েকটা বাক্য। চেষ্টা করলে অল্প কয়েকদিনে মুখস্থ হয়ে যাবে।

রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলুন 'রাব্বানা লাকাল হামদ', 'হে আমার রব, সকল প্রশংসা তোমার।' আমার রবকে এটা বললে তো আমার লজ্জা লাগার কথা না। আমরা হুজুরের কাছে, মন্ত্রীর কাছে কিছু বলতে গেলে কত প্রশংসা করে তারপর বলি। আর আল্লাহ যিনি আমার খালিক, আমার মালিক, যিনি অসীম দয়ালু; তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার আগে, তাঁর প্রশংসা করে তারপর চাইলে নিশ্চয়ই আমাদের লজ্জা বা কষ্ট লাগার কথা না।

আল্লাহু আকবার বলে মহব্বতের সাথে সিজদায় কপাল রাখুন মাটিতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বান্দা যখন নামাজে সিজদায় যায়, তখন সে আল্লাহর সবচেয়ে কাছে চলে যায়।'

কাজেই সিজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি চান, চাইতে থাকুন। সিজদায় আপনি যা চাইবেন আল্লাহ তা কবুল করে নিবেন ইনশাআল্লাহ। কাজেই সিজদায় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। তবে তা অবশ্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১৮৯] আবু দাউদ ১/২৩০, নং ৮৭৩

ওয়াসাল্লামের শেখানো সুন্নাত, মাসনুন দুআগুলোর মাধ্যমে। ছোট ছোট দুআ, কী মজার দুআ। সব চাওয়া হয়ে যায় এগুলো পড়লে। যেমন,

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস আলুকাল হুদা ওয়াভুকা, ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা' কতটুকু সময় লাগল এটা পড়তে? কিন্তু এই সময়ে আমরা কী চাইলাম আল্লাহর কাছে,

'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চাইছি হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা।' |

দেখুন, কেমন সামগ্রিক একটি দুআ। সব চাওয়া হয়ে গেল। তারপর কুরআনে যেসব দুআ আছে সেগুলোও পড়বেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য শিখিয়ে দিচ্ছেন,

'হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।'

এটি দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে সফলতার জন্য মুমিন ব্যক্তিদের আল্লাহর দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। সহীহ হাদিস থেকে জানা যায়, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে অধিকাংশ সময় এ দুআটি করতেন।।৯০। এরচেয়ে বড় দুআ আর নেই। এই দুআ যদি আপনি পড়তে পারেন আপনার বড়লোক হতে বেশি সময় লাগবে না।

হজে যারা যান তাদের জন্য হজের খাস দুআ হলো এই দুআ। হজে গেলে কারো হজ যদি কবুল হয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তার আর কোনো অভাব থাকে না।' কাজেই আল্লাহর কাছে এই দুআটি করতে থাকুন।

আমরা নামাজ নষ্ট করি দুই জায়গায়তে বেশি। একবার রুকু থেকে উঠে পুরো সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে, আর সিজদা থেকে উঠে দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে না বসে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে দুআ করতেন।

[১৯০] সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ডউত্র

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي

'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।'

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াজবুরনী ওয়া'আফিনি, ওয়ারযুক্বনী, ওয়ারফা'নী।১৯৯

এই দুআগুলো একটু শান্তভাবে পড়তে সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডে সময় লাগে। এই পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড সময়ে আমরা আল্লাহর কাছে কী চাইলাম? আবার খেয়াল করুন। আমরা আল্লাহ তাআলাকে বলছি,

'হে আল্লাহ, আমার গুনাহগুলো মাফ করে দাও। আল্লাহ আমাকে রহমত করো, রহমত দিয়ে আমার জীবন ভরে দাও আল্লাহ। আল্লাহ, আমার রিযিক বাড়িয়ে দাও। আল্লাহ, আমাকে হিদায়াত দান করো। আল্লাহ, আমকে পরিপূর্ণ সুস্থতা এবং নিরাপত্তা দাও। আল্লাহ, আমার গুনাহগুলো মুছে দাও। আল্লাহ, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। আল্লাহ, আমার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দাও।'

[লেখা: খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর]

উপসংহার

নামাজ ইসলামের সেই মহান ইবাদত, যা ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী নির্দেশক। এটি শুধু শারীরিক কিছু কাজের সমষ্টি নয়, বরং হৃদয়ের খুশু, আত্মার শুদ্ধি এবং আল্লাহর সঙ্গে গভীর সংযোগের নাম। একটি মুসলিম ব্যক্তিত্বের গঠনে সালাতের ভূমিকা অপরিসীম।

এই গবেষণাকর্মে আমরা সালাতের গুরুত্ব, কুরআন ও হাদীসে এর মর্যাদা, নারী ও শিশুদের জন্য নামাজ শিক্ষা, আধুনিক জীবনে নামাজের প্রয়োজনীয়তা, সালাত বনাম অন্যান্য ইবাদতের তুলনামূলক আলোচনা এবং বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে নামাজ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি আলোচনা করেছি।

আমরা দেখতে পাই:

নামাজ মানুষকে অশ্লীলতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে।

সালাত প্রতিদিনকার জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণ, সময়ানুবর্তিতা ও খোদাভীতির অনুশীলন।

নারী ও শিশুদের মাঝে নামাজ শিক্ষা এক প্রজন্মকে দ্বীনের পথে স্থায়ী করতে পারে।

আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যস্ত জীবনস্রোতেও সালাত পরিত্যাগের কোনো বৈধতা নেই।

সালাত অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং তা ত্যাগ করা মারাত্মক গুনাহ।

সুতরাং, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি, নৈতিকতা ও আল্লাহভীতি বজায় রাখতে চাইলে সর্বাগ্রে সালাতকে জীবনের কেন্দ্রস্থানে রাখতে হবে। সালাতের মাধ্যমে একজন মুসলিম তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যা মানব জীবনের আসল লক্ষ্য।